● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ - فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিয়া লও—মদ, জুয়া আর পূজার মূর্ত্তি এবং লটারী—এই সবই অপবিত্র এবং শয়তানী কার্য্যের বস্তু, তোমরা এই সব বর্জ্জন করিয়া চল। ইহাতেই তোমাদের সাফল্য। শয়তান চায় যে, তোমাদিগকে মদ ও জুয়ায় লিপ্ত করিয়া তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করে; (যদ্দারা সে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি কাটাকাটির ন্যায় বড় বড় পাপ সহজেই করাইতে সক্ষম হইবে।) আর আল্লার ইয়াদ হইতে এবং নামায হইতে বিরত রাখে। (আল্লাহকে ভুলিয়া গেলে সংযত জীবন যাপনের মূল চাবি-কাটিই নষ্ট হইয়া গেল। নামায ছুটিয়া গেলে কুকর্ম্ম ও অপকর্ম্ম হইতে বাঁচিয়া থাকিবার লাগামই ছিন্ন হইয়া গেল। এইভাবে মদ ও জুয়ার মাধ্যমে গোটা জীবনই ধ্বংসের মুখে পতিত হইবে। অতএব, এখন মদ ও জুয়ার ধ্বংসাত্মক অপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছ এবং আমার স্পষ্ট নিষেধ শুনিয়া নিয়াছ?) এখন ত তোমরা অবশ্যই এই সব হইতে বিরত থাকিবে?" (৭ পারা ২ রুকু)

উল্লেখিত আয়াত সম্পর্কেই নিম্নে বর্ণিত হাদীছ খানা—

**১৯০৯ হাদীছ ঃ**- আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, শরাব বা মদ হারাম বলিয়া যেই সময় কোরআনের ঘোষনা নাযেল হইয়াছে তখন মদীনা এলাকায় পাঁচ প্রকার পানীয় মাদক দ্রব্য প্রচলিত ছিল। উহার কোন একটিও আঙ্গুরের রশে তৈরী হইত না।

**ব্যাখ্যা ঃ**—উল্লেখিত বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, কোরআনে বর্ণিত "خمر—খাম্‌র" শব্দটির অর্থ যাহারা আঙ্গুরের রশে তৈরী মদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিতে চায় তাহারা কোরআনের অপব্যাখ্যাকারী এবং স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যাঁহার উপর কোরআন নাযেল হইয়াছিল ও আরবী ভাষা-ভাষী ছাহাবীগণ—যাঁহাদের সম্মুখে কোরআন নাযেল হইয়াছিল—তাঁহাদের সকলের ব্যাখ্যার বিরোধী ব্যাখ্যাকারী।

কারণ, মদ হারাম হওয়ার ঘোষনা خمر—খাম্‌র শব্দের মাধ্যমে নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ও ছাহাবীগণ উক্ত বিধান মদীনা এলাকায় প্রচলিত পানীয় মাদক দ্রব্যসমূহের উপর প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ঢোল-শোহরতের মাধ্যমে উহার ব্যবহার এবং লেন-দেন ও ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষনা করিয়াছিলেন। ঐ সব পানীয় তৈরীর পাত্র সমূহকেও ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়াছিলেন। এমনকি ঐ সব পাত্রের সাধারণ ব্যবহারও দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত হারাম করিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকদের মালিকানায় পূর্ব্ব হইতে ঐ সব পানীয়ের যে ষ্টক মৌজুদ ছিল, ঘোষনার সঙ্গে সঙ্গে উহা ফেলিয়া দিয়া মদীনা এলাকার রাস্থা-ঘাট, অলি-গলি সমূহকে প্রবাহিত মদের নালায় পরিণত করা হইয়াছিল। পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আয়াতে মদ বা শরাবকে নিষিদ্ধ হারাম, নাপাক, অপবিত্র ও শয়তানী বস্তু ঘোষনা করিয়া এবং উহা বর্জ্জন করার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়া فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ—তোমরা উহা বর্জ্জন করিবে ত?" প্রশ্ন করা হইলে মদীনার ছাহাবীগণ বলিয়া উঠিয়াছিলেন—انْتَهَيْنَا رَبَّنَا انْتَهَيْنَا رَبَّنَا

"হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমরা চিরতরে উহা বর্জ্জন করিলাম—হে প্রভু পরওয়ারদেগার! আমরা চির তরে উহা বর্জ্জন করিলাম।"

خمر—খাম্‌র শব্দের মাধ্যমে মদ বা শরাব হারাম হওয়ার বিধান কোরআনে নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং হযরত (দঃ) এবং উপস্থিত ছাহাবীগণ এই সব করিয়াছিলেন। অথচ মোসলমানদের এলাকা মদীনা অঞ্চলে তখন যত প্রকার পানীয় মদ ছিল উহার মধ্যে কোনটিই আঙ্গুরের রশে তৈরী হইত না। সুতরাং যে কোন বস্তুতেই তৈরী হউক সকল প্রকার মদই হারাম।

নিম্নে বর্ণিত হাদীছদ্বয়েও ঐ তথ্যেরই আরও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে—

**১৯১০। হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের মদীনা অঞ্চলে পানীয় মদ একমাত্র উহাই ছিল যাহাকে "ফজীখ্" বলা হইয়া থাকে (যাহা কাঁচা খেজুরের পচাই দ্বারা তৈরী হয়।)

আনাছ (রাঃ) বলেন, একদা আমি (আমার মাতার দ্বিতীয় স্বামী—ছাহাবী) আবু তাল্‌হার গৃহে তাঁহার সঙ্গে কতিপয় ছাহাবীকে ঐ মদ পান করাইতে ছিলাম। এমতাবস্থায় তথায় এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং বলিল, আপনারা খবর পান নাই কি? সকলেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ খবর? সে বলিল, শরাব হারাম হওয়ার ঘোষণা হইয়াগিয়াছে। তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলে আমাকে মদের কলসগুলি ভাঙ্গিবার আদেশ করিলেন। ঐ একজন মাত্র লোকের সংবাদেই তাঁহারা উহা করিলেন। এ সম্পর্কে আর অধিক যোগ-জিজ্ঞাসাও করিলেন না।

**১৯১১। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি খলীফা ওমর (রাঃ)কে মিম্বারে দাঁড়াইয়া এই ভাষণ দিতে শুনিয়াছি ঃ—

হে লোক সকল! খাম্‌র—মদ বা শরাবকে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণায় হারাম সাব্যস্ত করা হইয়াছে। তোমরা জানিয়া রাখিও, উহা (শুধু আঙ্গুরের রশে তৈরী বস্তুতে সীমাবদ্ধ নহে। রবং উহা) সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার বস্তুতে তৈরী হইয়া থাকে, যথা—আঙ্গুর, খুরমা, মধু, গম ও যব। এতদ্ভিন্ন যে কোন বস্তুর মাদকাতায় হুস্-জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, উহাই খাম্‌র বা মদ ও শরাবের শ্রেণীভুক্ত।

**১৯১২। হাদীছ ঃ**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক শ্রেণীর (মোনাফেক) লোক ছিল যাহারা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে হাসি-ঠাট্টা ও রং-তামাসারূপে নানা প্রকার প্রশ্ন করিয়া থাকিত। (তাহাদের দেখাদেখি কোন কোন সাদা-সিধা মোসলমান ঠাট্টা ও তামাসারূপে নয়, কিন্তু অসংগত ধরণের প্রশ্ন করিল, যেমন—) এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কে? আর এক ব্যক্তি যাহার উট হারাইয়া গিয়াছিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার উটটি কোথায়? এই শ্রেণীর প্রশ্নকারীদেরকে হুশিয়ার করিয়া এই আয়াত নাযেল হয়—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা এমন বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করিও না (যাহার মধ্যে এমন উত্তরের সম্ভাবনা থাকে) যাহা প্রকাশে তোমাদের পক্ষে খারাবী হইবে।"

(ছুরা মায়েদাহ্—৭ পারা ৪ রুকু)

**ব্যাখ্যা ঃ**—বিভিন্ন ধরণের লোকগণ হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে নানা প্রকার অনাবশ্যক, বরং অসংগত প্রশ্নাবলী করিয়া বিরক্ত করিয়া থাকিত। এমনকি একদা তিনি ঐ শ্রেণীর প্রশ্নাবলীর আধিক্যে উত্ত্যক্ত হইয়া মিম্বারে আরোহণ করতঃ রাগের সহিত বলিলেন, তোমরা প্রশ্ন কর। যত প্রশ্নই করিবা আমি উত্তর দিব। বিশিষ্ট ছাহাবীগণ হযরতের রাগ বুঝিতে পারিলেন। এমনকি তাঁহারা মাথা গোঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু সাদা-সিধা রকমের কতিপয় ছাহাবী তাহা লক্ষ্য করিলেন না। তাঁহারা হযরতের উক্তিকে প্রশ্ন করার সুযোগ মনে করিয়া ঐ অসংগত শ্রেণীর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—

(১) আবদুল্লাহ-ইবনে-হোযাফাহ (রাঃ) নামক এক ছাহাবী ছিলেন, তাঁহার আকৃতি স্বীয় পিতা হোযাফাহ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আকৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্য ছিল বিধায় ঝগড়া-বিবাদের সময় লোকগণ তাঁহাকে পিতা সম্পর্কে বিদ্রূপোক্তি করিত। বহু দিন হইতে তিনি এই ব্যাপারে বিব্রত ছিলেন। আজ

তিনি সুযোগ মনে করিয়া হযরত (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পিতা কে? তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হযরত (দঃ) আমার পিতার নাম হোযাফাহ বলিয়া দিলে আর কাহারও কিছু বলিবার অবকাশ থাকিবে না।

(২) আর এক ব্যক্তি (তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছিল সে) জিজ্ঞাসা করিল, আমার পিতা কোথায় স্থান পাইয়াছে?

এই শ্রেণীর প্রশ্নাবলীর উত্তরে এমন একটা দিকের সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহার প্রকাশ মানুষ অবশ্যই খারাব মনে করিবে। যেমন প্রথম প্রশ্নকারীকে হযরত (দঃ) তাহার পিতার নাম হোযায়ফাহই বলিয়া দিলেন, কিন্তু তাহার বুদ্ধিমতী মাতা তাহাকে তাহার ঐ প্রশ্ন সম্পর্কে তিরস্কার করিলেন এবং বলিলেন, খোদা-নাখাস্তা যদি তোমার মাতার দ্বারা কোন খারাব কাজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকিত যাহা এত দিন গোপন ছিল তবে হযরত (দঃ) ত তোমার প্রশ্নের উত্তরে অন্য ব্যক্তির নাম বলিয়া দিতেন এবং চিরকালের জন্য সর্ব্বসমক্ষে মান-ইজ্জতের সমাধি-রচিত হইত।

দ্বিতীয় প্রশ্নকারীর উত্তরে হযরত বলিয়াছিলেন—فى النار অর্থাৎ তোমার পিতার বাসস্থান দোযখে। এই বিষয়টি প্রকাশ হওয়া তাহার জন্য খারাব হইল।

আরও একবারের ঘটণা ঃ—হযরত (দঃ) এলান করিলেন, সামর্থ্যবান লোকদের উপর হজ্জ ফরজ। প্রশ্ন করা হইল, প্রতি বৎসর? হযরত (দঃ) কিছু সময় চুপ থাকিবার পর বলিলেন, না—অর্থাৎ মাত্র একবার ফরজ। এই প্রশ্নটিও অবান্তর ছিল এবং সম্ভাবনা ছিল, "হাঁ" বলিয়া দেন—তা হইলে ব্যাপারটা কত কঠিন হইয়া পড়িত! হযরতও এই বিষয়ের ইঙ্গিতে বলিয়াছেন, لو قلت نعم لوجبت "যদি আমি "হাঁ" বলিয়াদিতাম তবে প্রত্যেক বৎসরের জন্যই হজ্জ ফরজ হইয়া যাইত।"

অসংগত প্রশ্ন সম্পর্কে খারাব উত্তরের সম্ভাবনা অন্ততঃ এতটুকু ত অবশ্যই থাকে যে, তিরস্কার বা রাগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ হইবে। যেমন এক ব্যক্তির উট হারাইয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তিও পূর্ব্বোল্লেখিত হযরতের ক্রোধজনিত সুযোগদানের কথায় এই প্রশ্ন করিয়া বসিল, আমার উটটি কোথায় হারাইয়াছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে তিরস্কার ও রাগ প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে যাহা অবশ্যই খারাব মনে করা হইবে। সুতরাং এই শ্রেণীর প্রশ্ন করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে!

বর্ত্তমান কালেও দেখা যায়, নায়েবে-নবী—আলেমগণের নিকট পরীক্ষামূলক হাসি-তামাসা মূলক বা বিব্রত করার উদ্দেশ্যক অসংগত ও অনাবশ্যক প্রশ্নাবলী করা হইয়া থাকে। এইরূপ প্রশ্ন মোটেই করা চাইনা। আলেমগণের নিকট শরীয়তের বিধান ও আখেরাতের উন্নতির পথ পাইবার উদ্দেশ্যজনক প্রশ্নই করা যাইতে পারে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَائِبَةٍ وَّلَا وَصِيْلَةٍ وَّلَا حَامٍ وَّلٰكِنَّ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ -

**তফছীর ঃ**-অন্ধকার- যুগে দুইটি কুপ্রথা ছিল—(১) দেব-দেবীদের নামে জানোয়ার ছাড়িয়া দেওয়া হইত। (২) বিশেষ বিশেষ জানোয়ার দেব-দেবীদের নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা হইত ও তাহাদের জন্য নিয়্যত করিয়া রাখা হইত এবং এই সূত্রে ঐ জানোয়ারকে সম্মান করা হইত। "বাহীরাহ্" "ছায়েবাহ্ "অছীলাহ্" "হাম"—এই সব বিভিন্ন নামে ঐ শ্রেণীর জানোয়ারের নাম করণ হইয়া থাকিত।

উল্লেখিত আয়াতে ঐ শ্রেণীর কুপ্রথা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ঐ ধরণের প্রথা আল্লাহ তায়ালা কখনও প্রবর্ত্তন করেন নাই, বরং উহা কাফের-মোশরেকদের গর্হিত কাজ। অবশ্য উহা দ্বারা তাহারা মিছামিছি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির দাবি ও আশা করিয়া থাকে, ইহা তাহাদের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়। (৭ পারা ৪ রুকু)

পাঠকবর্গ! উল্লেখিত প্রথাগুলির মূল দোষ হইল এই যে, উহা শেরেকী কাজ; আর শেরেকী কাজ দেব-দেবীর নামে হইলেও যেরূপ পীর-পয়গাম্বর ওলী-দরবেশের নামে হইলেও তদ্রূপই। সুতরাং মোছলমান নামধারী এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে---পীর, ওলী, দরবেশ বা তাহাদের মাজারের ও ওরোসের নামে কোন জানোয়ার ছাড়া হয় কিম্বা কোন জানোয়ারকে ঐ নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া, ঐ নামে নিয়্যত করিয়া উহার তাজিম ও সম্মান করা হয়। এমনকি উহাকে কেন্দ্র করিয়া খানা-পিনার বা গান-বাদ্যের ধুমধাম করা হয়, উহার জুলুস ও মিছিল করা হয় এই সবই শেরেকী কাজ। যেরূপ দেব-দেবীর নামে বা পীর-পয়গাম্বর, ওলী-দরবেশেয় নামে কোন জানোয়ার জবেহ করিলে তাহাও শেরেকী কাজ।

**মছ আলাহ ঃ**—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামে জানোয়ার জবেহ করিলে যেরূপ উহা মৃত গণ্য হইয়া হারাম হইয়া যায় তদ্রূপ আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও নামে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিলে—নিয়্যত করিয়া রাখিলে, এই অবস্থায় উহাকে আল্লার নামে জবেহ করিলেও উহা হারাম গণ্য হইবে। ঐ জানোয়ারকে হালাল করিতে হইলে উহা জবেহ করার পূর্ব্বে অন্যের নামে নিয়্যত ও নির্দ্দিষ্ট করার কার্য্য হইতে খাঁটী তওবা করিতে হইবে। তারপরে উহাকে আল্লার নামে জবাহ করা হইলে উহা হালালহইবে। (তফছীর বয়ানুল-কোরআন দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ ভিন্ন অন্যের নামে জানোয়ার ছাড়া বা নির্দ্ধারিত করা যে, ইসলামের বা কোন মোসলমানের কার্য্য নহে, বরং উহা জাহান্নামী কাফেরদের প্রবর্ত্তিত প্রথা।—নিম্নে বর্ণিত হাদীছে উহার একটি বিশেষ তথ্য ব্যক্ত হইয়াছে।

১৯১৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) (এক হাদীছে সূর্য্যগ্রহণের নামাযের বিবরণ দান পূর্ব্বক) বর্ণনা করিয়াছেন, নামায শেষ করিয়া হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ উভয়টিই আল্লাহ তায়ালার (অসীম ও সর্ব্বময় কুদরতের অসংখ্য) নিদর্শন সমূহের দুইটি নিদর্শন। উহা যখন তোমাদের সম্মুখে প্রকাশ পায় তখন তোমরা (আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়ার উদ্দেশ্য) নামাযে মশগুল থাক যাবৎনা উহা অপসারিত হইয়া যায়।

হযরত (দঃ) আরও বলিলেন, আমার এই নামায পড়াকালে আমাকে পরকালের সব কিছু দেখান হইয়াছে যাহার সংবাদ আমাকে দেওয়া হইয়াছিল। এমনকি (আমাকে বেহেশত এত নিকটবর্ত্তী দেখানো হইয়াছে যে,) আমি বেহেশত হইতে আঙ্গুরের একটি ছড়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া ছিলাম; যখন তোমরা আমাকে দেখিয়াছ, আমি সম্মুখ দিকে আগাইয়া ছিলাম। ঐ সময় আমি দোযখও দেখিয়াছি, উহার অগ্নিশিখাগুলি কিল্‌বিল্ করিতেছিল; তখনই তোমরা দেখিয়াছ, আমি পিছনের দিকে হটিয়া ছিলাম। তখন দোযখের মধ্যে আমর-ইবনে (লুহা'ই) খোযায়ীকে দেখিয়াছি—তাহার নাড়ি-ভুঁড়ি মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং সে ঐগুলিকে হেঁচড়াইয়া চলিতেছে। সে-ই সর্ব্ব প্রথম দেব-দেবীর (তথা গায়রুল্লাহ—আল্লাহ ভিন্ন অন্যের) নামে জীব-জন্তু ছাড়ার প্রথা চালু করিয়াছিল।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

وَعِنْدَهٗ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ - وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ -
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا - وَلَا حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمٰتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ -

পাপীদের কোন পাপই আল্লাহ তায়ালার অগোচরে থাকিতে পারে না—তাহা উপলক্ষ্য করিয়া উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান ও অবগতির অসীম ব্যাপকতা বর্ণনা করা হইয়াছে। মানুষের কার্য্য-কলাপ ত একটা সাধারণ জিনিষ—"আল্লার এলম তথা তাঁহার অসীম জ্ঞান ও অবগতির আয়াত্তে রহিয়াছে—সমুদয় গায়েব তথা ভূতভবিষ্যতের অগোচর, অদৃশ্য, গোপন কার্য্য কলাপ ও রহস্যাদির ভাণ্ডারসমূহ এবং উহার চাবিকাঠি তাঁহারই হাতে রহিয়াছে। সেই ভাণ্ডার সমূহ বা উহার চাবিকাঠি আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও অনুভূতির আয়াত্তে নাই। জলে-স্থলে—যথায় যাহা কিছু ঘটে, ঘটিয়াছে বা ঘটিবে সবই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। (নিবিড় জঙ্গলে গভীর অন্ধকারে ছোট্ট হইতে ছোট্ট) একটি পাতাও যদি ঝরে

তাহাও আল্লার অজ্ঞাতে হইতে পারে না। তাহাও আল্লাহ তায়ালা সম্যকরূপে জ্ঞাত থাকেন। কোন একটি ক্ষুদ্রতম দানা বা বীজ যাহা ভূগর্ভে অন্ধকারের অন্তরালে রহিয়াছে তাহা এবং যত প্রকার তাজা বা শুষ্ক বস্তু রহিয়াছে (সব কিছুই আল্লাহ তায়ালার জানা রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বরং) সব কিছু লওহে-মাহফুজে লিখিত রহিয়াছে।" (ছুরা আন্‌য়া'ম—৭ পারা ১৩ রূকু)

মহান আল্লার গুণাবলীর অসীমতা সম্পর্কে মানুষ এতটুকুই ভাবিতে পারে—

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم - واز هرچه گفته ایم وخوا نده ایم

হে খোদা! তুমি সব কিছুরই উর্দ্ধে, সব কিছুরই নাগালের বাহিরে—আমাদের অনুমানের, আমাদের কল্পনার, আমাদের ধারণার, আমাদের চিন্তার এবং যতদুর আমরা বলিতে পারি, যতদুর আমরা গবেষণা করিতে পারি।

উল্লেখিত আয়াতে গায়েবের ভাণ্ডারসমূহ বা গায়েবের চাবিকাঠি সমূহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই আয়ত্তে বলা হইয়াছে; অর্থাৎ অন্য কেহই সামগ্রিকভাবে গায়েবের সকল বিষয় জানে না। তাহা বুঝাইবার জন্য নমুনা বা উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে বর্ণিত হাদীছে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে যাহা সচরাচর সকলের সম্মুখেই উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু ঐগুলি যে পর্য্যন্ত গায়েব তথা অদৃশ্যের অন্তারালে থাকে সে পর্য্যন্ত কেহই উহাকে নির্দ্দিষ্ট ও সম্যকরূপে জ্ঞাত হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা ঐ অবস্থায়ও ঐগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত থাকেন।

**১৯১৪। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (পবিত্র কোরআনে যে,) গায়েবের ভাণ্ডারসমূহ বা চাবিকাঠি সমূহ (বলা হইয়াছে উহার উদাহরণমালা কোরআনেই অন্যত্র বর্ণিত আছে, তাহা) পাঁচটি। যথা—(১) আগামী কাল কি হইবে, কে কি করিবে তাহা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ সম্যকরূপে জ্ঞাত নহে। (২) নারীদের গর্ভাশয় যাহা খালাস করিয়া থাকে (খালাস হওয়ার পূর্ব্বে) উহার পূর্ণ অবস্থা সম্যকরূপে আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জ্ঞাত নহে। (৩) বৃষ্টি কবে এবং ঠিক কোন সময় বর্ষিবে তাহার পূর্ণ ও সঠিক তথ্য অটল, অনড় ও নির্ভুলভাবে আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জ্ঞাত নহে। (৪) কেহই তাহার মৃত্যু কোথায় হইবে তাহা জানে না (আল্লাহ তায়ালা তাহা জানেন)। (৫) কেয়ামত বা মহাপ্রলয় কবে হইবে তাহা আল্লাহ ভিন্ন আর কেহই জানে না।

(এই প্রসঙ্গে হযরত (দঃ) এই আয়াতটি তেলয়াত করিলেন—)

إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ - وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ - وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ -

وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا - وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ - اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

আল্লাহ্ জানেন কেয়ামত সম্পর্কে এবং তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া থাকেন। এবং মাতৃগর্ভে যাহা আছে তাহার পূর্ণ হাল অবস্থাও তিনিই জানেন। আর কোন ব্যক্তি নিজেও জানে না, সে আগামী কাল কি করিবে এবং কোন ব্যক্তি নিজেও জ্ঞাত নহে, তাহার মৃত্যু কোন স্থানে হইবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় সব কিছু জানেন ও খবর রাখেন।" (২১ পাঃ—ছুরা লোকমান সমাপ্তে)

**ব্যাখ্যা**—উল্লেখিত আয়াতে খাজানায়ে-গায়েব তথা গায়েব বা অদৃশ্য বস্তু সমূহের ও গোপন রহস্যাবলীর ভাণ্ডার হইতে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) আলোচ্য হাদীছে مفاتح الغيب—মাফাতেহুল গায়েব তথা খাজানায়ে-গায়েবের উদাহরণ রূপে উক্ত পাঁচটি বিষয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। গায়েবের মালিক একমাত্র আল্লাহ; গায়েব সম্পর্কে হস্তক্ষেপের ক্ষমতা আর কাহারও নাই, তাহা চাক্ষুস প্রামাণিকরূপে বুঝাইবার জন্য উক্ত পাঁচটি বিষয়ের উদাহরণ অত্যন্ত উপযোগী।

(১) কেয়ামত কবে হইবে?

সমস্ত লোকই এই ধরাপৃষ্ঠে বসাবস করিতেছে, বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিক রাজা-বাদশা, নবী-রসুল, পীর-আওলিয়া সকলেই এই বসুন্ধরার অধিবাসী, কিন্তু কেহই বলিতে পারে না ও পারে নাই—ইহার বিলুপ্তি ও পরিসমাপ্তির দিন কেন্‌টি। নিজ গৃহের খবরই যাহার নাই সে খাজানায়ে-গায়েবের অগণিত রহস্যাবলীর জ্ঞান আয়াত্তকারী কিরূপে হইতে পারে?

(২) বৃষ্টি সম্পর্কীয় সম্যক জ্ঞান ঃ

মানুষের এই আবাসগৃহ ভূমণ্ডলের জীবনী শক্তি নির্ভর করে বৃষ্টির উপর এবং মানুষের জীবনধারণের উপকরণগুলির অস্তিত্বও সেই বৃষ্টির উপরই নির্ভরশীল। এমন একটি আবশ্যকীয় বস্তু উহা এবং সকলের সম্মুখেই উহার গমণাগমন হইতেছে, এতদসত্বেও মানুষ উহার গোপন রহস্যগুলির সম্যক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মানুষ নির্ভুলরূপে এতটুকুও জানে না, ঠিক কোন সময়, কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষিবে *। সেই মানুষ খাজানায়ে-গায়েবকে তাহার আওতায় কিরূপে আনিতে

* বিজ্ঞানের এই সর্ব্বাত্মক উন্নতির যুগেও যান্ত্রিক সাহায্য যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহা পূর্ব্বাভাস মাত্র। নির্ভুল সঠিক সংবাদ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা সম্ভব

(পর পৃষ্ঠায় দেখুন)

পারে ? অবশ্য আল্লাহ তায়ালা উহা এবং উহার সমুদয় সৃষ্টি রহস্যও সম্যকরূপে জ্ঞাত আছেন। কেননা, তিনিই বৃষ্টির এবং উহার বর্ষণ তাঁহারই ক্ষমতা ও আদেশাধীন।

(৩) গর্ভাশয়ের সন্তান সম্পর্কীয় জ্ঞান ঃ

গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কীয় জ্ঞান যে, উহা নর, না—নারী এবং গর্ভ খালাসে সময় বেশী যাইবে না কম তাহাও মানুষ সম্যক, সঠিক ও নির্ভুলরূপে নির্ণয় করিতে অক্ষম। বিজ্ঞানের এই জয়জয়কারের যুগেও তাহা সম্ভব হয় নই। মাতা দীর্ঘ দিন উহা বহন করিয়া থাকে সেও উহা নির্ণয় করিতে অক্ষম। এত নিকটস্থ এবং এত আঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত একটি বস্তু সম্পর্কে যে মানুষ এত অজ্ঞ সেই মানুষ খাজানায়ে-গায়েবকে কিরূপে জয় করিতে পারিবে ?

(৪) আগামী কল্য কি করিবে ?

অপরের ত দূরের কথা নিজে আগামী দিন কি করিবে এবং আগামী দিন তাহার পক্ষে কি ঘটিবে সে সম্পর্কেও প্রত্যেকটি মানুষ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে মানুষ নিজের সম্পর্কেই এত অজ্ঞ সে খাজানায়ে-গায়েবকে কিরূপে জানিতে পারে ?

(৫) কোথায় মৃত্যু হইবে ?

প্রত্যেক মানুষ নিজের সম্পর্কেই এত অজ্ঞ যে, তাহার ইহজগতের সর্ব্বশেষ অবস্থা যে মৃত্যু সেই মৃত্যু কোন্ সময় কোথায় আসিবে তাহাও সে জানে না। সেই মানুষ অসীম অসংখ্য খাজানায়ে-গায়েবের জ্ঞান জয়কারী কিরূপে হইবে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমুদয় গায়েব তথা গুণী-জ্ঞানী, বিজ্ঞানী সমগ্র মানব-দানবেরও দৃষ্টির আগোচরে ও সমগ্র সৃষ্টির অনুভূতির অন্তরালে যে রহস্যমালার অসীম ময়দান ও কুলহীন সমুদ্র আছে তাহা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার আয়ত্তাধীন রহিয়াছে বলিয়া পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানেই বিঘোষিত রহিয়াছে। ইহা দ্বারা মানব সমাজকে এই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে যে—

পবিত্র কোরআন বা প্রেরিত রসুল মারফৎ আল্লাহ তায়ালা যে আদর্শ দান করিয়াছেন এবং উহাতে যে, বিধি-বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, যে আদেশ নিষেধ প্রদান করিয়াছেন, যে যে ভাগ-বন্টন বা সীমা রেখা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন,

---

হয় নাই, হইবেও না। এতদ্ভিন্ন এই পূর্ব্বাভাসও এলমে-গায়েব মোটেই নহে, বরং কোন বস্তুর লক্ষণ দেখিয়া উহার আগমণের ধারণা করা মাত্র, যাহা একটি অতি সহজ ও স্বাভাবিক বিষয়। যেরূপ আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখিয়া বৃষ্টির আগমণ সাধারণ ভাবেই অনুভব করা হইয়া থাকে। সাধারণ দৃষ্টিতে মোটা জিনিষই ধরা পড়ে। তাই এখানেও মোটা নিদর্শনের উপরই নির্ভর করা হয়। যান্ত্রিক সাহায্যে সূক্ষ্ম নিদর্শনও দেখা যায় যাহা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় না। তাই যন্ত্রধারীগণ সাধারণ লোকদের একটু পূর্ব্বে সংবাদ দিতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে উভয়েই লক্ষণ দেখিয়া বস্তুর আগমণ অনুভবকারী।

উহার ( Revise, reform ) পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও সংশোধন বা উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদি কোন প্রকার হস্তক্ষেপের অবকাশ কোন সৃষ্টের জন্য থাকিতে পারে না। কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ কোন হস্তক্ষেপ যুক্তিযুক্ত বিলয়া দৃষ্ট হইলে তাহা সৃষ্টির দৃষ্টির ক্ষুদ্রতা ও সীমাবদ্ধতার কারণেই হইবে। তাই উহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আলেমুল-গায়েব সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশকেই মানিয়া চলিতে হইবে।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ -

মানুষকে বিপদ-আপদ হইতে আল্লাহ তায়ালাই সুরক্ষিত রাখেন। মানুষ সুখে থাকিয়া আল্লাহ তায়ালাকে যেন ভুলিয়া না যায়, সেই উদ্দেশ্যে মানুষকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যেরূপ রক্ষা করিতে পারেন তদ্রূপ তাঁহার নাফরমানী করিলে "তিনি ইহাও করিতে পারেন যে, তোমাদেরে ধ্বংসকারী আজাব পাঠাইয়া দেন উপরের দিক হইতে, ( যেমন উপর হইতে শিলা-পাথর বর্ষণ, অগ্নিময় বজ্রপাত, অগ্নিময় বা হিম বায়ু প্রবাহণ, ঝড়, তুফান ইত্যাদি। ) বা নীচের দিক হইতে, ( যেমন দেশময় প্রলয়কর ভূকম্পন ও ভূধসন ইত্যাদি। ) কিম্বা তোমাদের মধ্যে দলাদলী সৃষ্টি করিয়া পরস্পর ঝগরা-বিবাদ, মারামারি কাটাকাটিতে লিপ্ত করিয়া দিতে পারেন।" ( ছুরা আন্‌য়া'ম—৭ পারা ১৪ রুকু )

নাফরমানদিগকে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতে পূর্ণ শাস্তি দিবেন, দুনিয়াতেও তাহাদিগকে শায়েস্তা করার জন্য এবং পরবর্ত্তী যুগকে শিক্ষা দান ও সতর্ক করার জন্য বিভিন্ন প্রকার আজাব পাঠাইবার ব্যবস্থাও রাখিয়াছেন। আলোচ্য আয়াতে সেই সব আজাবেরই বর্ণনা দান করা হইয়াছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী নবীদের উম্মৎগণ নাফরমানীতে লিপ্ত হইলে তাহাদের উপর উল্লেখিত আজাব সমূহ আসিয়াছে এবং তাহারা উহাতে ধ্বংস হইয়াছে। তাহাদের ধ্বংসের বহু ইতিহাস চতুর্থ খণ্ডে পবিত্র কোরআন হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) স্বীয় উম্মতের স্নেহ-মমতা তাহাদের সুখ সুবিধার আকাঙ্খা কোন ক্ষেত্রেই ভুলেন নাই। তিনি ভাবিলেন, উক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রথম দুই প্রকারের আজাব আসিলে অপরাধীগণ তওবা করার ও সংশোধিত হওয়ার সুযোগ খুব কমই পায় এবং সহসা ধ্বংস হইয়া যায়—যেরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎগণ হইয়াছে। অবশ্য তৃতীয় প্রকারের আজাবটি এরূপ যে, ঐ ক্ষেত্রে

দীর্ঘ দিনের সুযোগ পাওয়া যায় এবং অপরাধীগণ সহসা সমূলে ধ্বংস হইয়া যায় না। তাহারা তওবার ও সংশোধনের সুযোগ পাইতে পারে।

নাফরমান অপরাধীগণকে সতর্ক করিয়া যখন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত আজাবত্রয়ের বিবরণ দান করিলেন, তখন অপরাধীগণের পক্ষেও দয়াল নবীর স্নেহ মমতার ঢেউ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি আল্লার দরবারে হাত উঠাইলেন—হে পরওারদেগার! আমার উম্মৎ যদি শাস্তির উপযুক্ত হইয়া পড়ে তবুও তাহাদের উপর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার আজাব পাঠাইওনা। তোমার প্রতি ধাবিত করার উদ্দেশ্যে শায়েস্তা ও সতর্ক করার প্রয়োজনে তাহাদিগকে তৃতীয় প্রকারের আজাব দ্বারা হুশিয়ার করিও, যেন তাহারা তওবা করার এবং সংশোধিত হওয়ার সুযোগ পায়। নিম্নে বর্ণিত হাদীছে হযরতের এই দোয়ারই বর্ণনা হইয়াছে এবং হযরতের এই দোয়া আল্লার দরবারে কবুল হইয়াছে।

**১৯১৫। হাদীছ ঃ**—ছাহাবী জাবের (রাঃ) উল্লেখিত আয়াত নাযেল হওয়া-কালের বর্ণনা করিয়াছেন, "عذابا من فوقكم উপরের দিক হইতে আগত আজাব" এর উল্লেখ হইলে সঙ্গে সঙ্গে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে পরওয়ার-দেগার! আমি করজোড়ে তোমার নিকট এই শ্রেণীর আজাব হইতে পানাহ্ চাই এবং "او من تحت ارجلكم—নীচের দিক হইতে আগত আজাব"-এর উল্লেখ হইলে হযরত (দঃ) দোয়া করিয়াছেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট এই শ্রেণীর আজাব হইতেও পানাহ্ চাই। অতঃপর —او يلبسكم شيعا— তোমাদের মধ্যে বিভেদ ও দলাদলী সৃষ্টি করিয়া সংঘর্ষে লিপ্ত করিতে পারেন" এর উল্লেখ হইলে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, ইহা পূর্ব্বের দুইটি অপেক্ষা সহজ ও নরম আজাব, (যেহেতু ইহার ক্ষেত্রে তওবা ও সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায়।)

**ব্যাখ্যা ঃ**—উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল—জাতীয় অনৈক্য, বিভেদ ও দলাদলি তুচ্ছ ও অবহেলার বস্তু নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আল্লার আজাব। জাতিগতভাবে আল্লার নাফরমানী করা হইলে আল্লাহ তায়ালা জাতিকে এই আজাবে লিপ্ত করিয়া থাকেন, তাই ইহা হইতে বাঁচিতে হইলে সম্মিলিতভাবে আল্লার প্রতি ধাবিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

স্মরণ রাখিবেন—প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের আজাব ব্যাপক আকারে সমুদয় জাতিকে সহসা ধ্বংস করিয়া দেয়। যেরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতদের অবস্থা হইয়াছে—তাহা হইতে আল্লাহ তায়ালা এই উম্মৎকে রেহায়ী দিয়াছেন। কিন্তু এক জনের দ্বারা দশ জনকে সতর্ক করার জন্য স্থান বিশেষে ঐরূপ আজাব এই উম্মতের মধ্যেও আসিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি বা স্থান বিশেষে আসে; ব্যাপকরূপে আসে না।

**১৯১৬। হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামত কায়েম হওয়ার পূর্ব্বে অবশ্যই একদিন সূর্য্য তাহার অস্ত যাওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে এবং সকলেই তাহা দেখিতে পাইবে। তৎকালীন বিশ্ববাসী উহা দেখিয়া ( বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে যে, কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, তাই তখন ) সকলেই ঈমান আনিবে, কিন্তু ( যাহারা পূর্ব্ব হইতে ঈমানদার ছিল না, শুধু তখন ঈমান আনিয়াছে—তাহাদের ঈমান গৃহিত হইবে না। কারণ, ) তখনকার সময়টিই ঐ সময় যখন ঈমান গ্রহণীয় নহে বলিয়া কোরআনের ঘোষণা রহিয়াছে—

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا

**ব্যাখ্যা ঃ**—আল্লার কালাম কোরআন এবং আল্লার রসুল ও তাঁহার বর্ণনায় বিশ্বাস করিয়া বা সৃষ্টিগত সত্য-উপলব্ধি শক্তির প্রভাবে আল্লার প্রতি ইমান আনা, আখেরাতের প্রতি ইমান আনা এবং আল্লার ভয়ে ও আখেরাতের ভয়ে পাপ হইতে তওবা করা—এই ঈমান ও তওবাই হইল যথার্থ ও ফলদায়ক এবং সেই ঈমান ও তওবাই গ্রহণীয়। পক্ষান্তরে আখেরাতে সকলেই ঈমান প্রকাশ করিবে। কিন্তু সেই ঈমানের প্রতি মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা হইবে না বলিয়া পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ রহিয়াছে। তদ্রূপ ইহজগৎ ত্যাগের মুহূর্ত্ত উপনীত হইলে—যখন ফেরেশতা ইত্যাদি দেখার স্বাভাবিক চক্ষু খুলিয়া যায়, তখনকার ঈমান এবং তওবাও গ্রহণীয় নহে। এতদ্ভিন্ন কেয়ামত অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ার কতিপয় বিশেষ নিদর্শন আছে উহা প্রকাশিত হইয়া কেয়ামতের বাস্তবতা প্রত্যক্ষের পর্য্যায়ে প্রমাণিত হইয়া গেলে তখনকার ঈমান এবং তওবাও গৃহিত হইবে না এই বিষয়টিই এই আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে—

يَوْمَ يَاْتِىْ بَعْضُ اٰيٰتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ

مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا -

"যে দিন তোমার প্রভু-পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে ( কেয়ামতের বড় বড় নিদর্শগুলির ) বিশেষ নিদর্শনটি প্রকাশ হইয়া যাইবে সেদিন ঐ ব্যক্তির ঈমান ফল-প্রদ হইবে না যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ঈমান আনিয়াছিল না। কিম্বা ( পূর্ব্ব হইতে ঈমান ছিল, কিন্তু ঈমান অবস্থায় কোন নেক আমল করে নাই—সারা জীবন গোণার কাজে নিমগ্ন ছিল, তওবা করে নাই ; সেই দিন ঐ অবস্থা দেখিয়া তাহার চৈতন্য হইয়াছে এবং তওবা করিয়াছে, ) তাহার তওবাও কোন ফল-প্রদ হইবে না।"

( ৮ পারা—ছুরা আন্‌য়াম শেষ )

এই আয়াতে যে বিশেষ নিদর্শনের উল্লেখ রহিয়াছে উহারই ব্যাখ্যা আলোচ্য হাদীছে করা হইয়াছে—উহা হইল সূর্য্য অস্ত যাওয়ার দিক হইতে উদিত হওয়া। কেয়ামত অতি নিকটবর্ত্তী হওয়ার সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাধিক ব্যাপক নিদর্শন এই যে—একদিন সূর্য্য উদিত হওয়ার দিক হইতে উদিত না হইয়া অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ঐদিক হইতে চলিয়া মধ্য আকাশে পৌঁছিবে, পূণরায় ঐ দিকে ফিরিয়া যাইবে এবং স্বাভাবিকরূপে অস্তমিত হইবে। অবশ্য অতঃপর যে কয়দিন দুনিয়া বাকি থাকিবে স্বাভাবিকরূপেই উদিত ও অস্তমিত হইবে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—অস্ত যাওয়ার দিক হইতে সূর্য্য উদয় হওয়া সম্পর্কে ছুরা ইয়াছীনের একটি আয়াতের তফছীরে বর্ণিত একটি হাদীছে কিছু তথ্য রহিয়াছে। নিম্নে ঐ হাদীছটি ৪৫৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করা হইল—

**১৯১৭। হাদীছ ঃ**—আবুজর গেফারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি সূর্য্য অস্ত যাওয়াকালে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মসজিদে ছিলাম। হযরত (দঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবুজর! জান কি, সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? আমি আরজ করিলাম, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা জানেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, সূর্য্য চলিতে চলিতে আরশের নীচে যাইয়া সেজ্‌দা করিবে এবং (সম্মুখপানে চলিয়া উদিত হওয়ার) অনুমতি প্রার্থনা করিবে। তাহাকে অনুমতি দেওয়া হইবে! কিন্তু এমন একটি দিন নিশ্চয় আসিবে যে দিন সে এইরূপ সেজ্‌দা করিবে, কিন্তু তাহার সেজদা কবুল হইবে না (তথা তাহার সেজদার উদ্দেশ্য পূরণ করা হইবে না)। অনুমতি চাহিবে, কিন্তু তাহাকে ঐ অনুমতি দেওয়া হইবে না। তাহাকে আদেশ করা হইবে—যেই পথে আসিয়াছ সেই পথে ফিরিয়া যাও। যাহার ফলে সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার দিক হইতে উদিত হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য এই এই আয়াতের—

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ -

"(ইহাও মহান আল্লাহ তায়ালার তৌহীদ ও একত্বের একটি প্রমাণ যে,) সূর্য্য তাহার নির্দ্ধারিত ঠিকানার দিকে চলিতে থাকে; ইহা সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ তায়ালারই নির্দ্ধারিত সুশৃঙ্খল নিয়ম।"

**ব্যাখ্যা ঃ**—সারা সৃষ্টি জগতের পক্ষে কল্যাণময় এই বিশাল সূর্য্য যাহা এই ভূমণ্ডল অপেক্ষা ১৩ লক্ষ গুণ বড়, যাহার গুণাগুণ বা বিশালতা দৃষ্টে উহাকে এক শ্রেণীর লোক পূজনীয়রূপে বরণ করিয়াছে। আবহমান কাল হইতে সর্ব্ব সমক্ষে সুশৃঙ্খলতার সহিত সূর্য্যের গতিবিধি পরিচালিত হইতেছে, কিন্তু সূর্য্য তাহার

গতিবিধিতে স্বয়ংক্রিয় বা স্বাধীন নহে। তাহার জন্য নির্দ্ধারিত নিয়মের চুল পরিমাণ ব্যতিক্রমও সে করিতে পারে না। সুতরাং ইহা বাস্তবিকই মহান আল্লার একত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই বিষয়টিই আলোচ্য হাদীছে সুস্পষ্ট ভাষায় খুলিয়া বলা হইয়াছে।

চন্দ্র সূর্য্য ও উহাদের কক্ষগুলি সহ সমুদয় সৌর-জগৎই আরশের নীচে রহিয়াছে। আরশ ত এই সবের সমষ্টি হইতে বহু বহু গুণে সুপ্রশস্ত। সুতরাং সূর্য্য প্রত্যেক অবস্থায় এবং প্রত্যেক স্থানে সদা সর্ব্বদাই আরশের নীচে রহিয়াছে। অতএব, আলোচ্য হাদীছে সূর্য আরশের নীচে যাওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, যে মহাশক্তির পরিচালন-ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ-কার্য্যের বিকাশ হইয়া থাকে আরশ হইতে* সেই শক্তির করায়ত্ত, অধীনস্থ ও অনুগতরূপে সূর্য্য ঐ ঐ স্থানের দিকে চলিতে থাকে যে যে স্থানকে বিভিন্ন ভূখণ্ডের জন্য সেই মহাশক্তি সূর্য্যের কেন্দ্ররূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, তথায় যাইয়া সূর্য্যকে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে।

আল্লার রসুল বুঝাইতে চাহিতেছেন, আবহমান কাল হইতে যে দেখা যায়, সূর্য্য একদিক হইতে উদিত হইয়া অপর দিকে অস্তমিত হইতেছে। তাহার এই বিরাম-হীন গমনাগমন নিছক স্বেচ্ছাক্রমের ও স্বক্রিয় ভাবের নহে, বরং উহার মূলে রহিয়াছে মহান আল্লার তরফ হইতে তাহার জন্য নির্দ্ধারিত বিভিন্ন কেন্দ্র ও ষ্টেশন অতিক্রম করার আদেশ ও অনুমতি। সুতরাং প্রতীয়মান হইল যে, সূর্য্যও সেই মহাশক্তি তথা মহান আল্লার সম্মুখে একটি নগণ্য অনুগত দাসই বটে। অতএব সূর্য্যকে পূজা না করিয়া মহান আল্লাহকেই একমাত্র পূজণীয় রূপে গ্রহণ করিবে।

সূর্য্যের সেজদা-রহস্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের একটা সংবাদ স্মরণ করা বিশেষ ফলদায়ক হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"বিশ্চচরাচরের প্রতিটি বস্তুই নিজ নিজ কায়দায় সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালার তছবীহ পাঠ (তথা গুণ-গান ও পবিত্রতা বর্ণনা) করিয়া থাকে। অবশ্য তোমরা উহাদের তছবীহ পাঠ বুঝিতে ও অনুধাবন করিতে সক্ষম নও।" (১৫ পারা—৫ রুকু)

দার্শনিক কবি মাওলানা রুমীর আর একটি তথ্যও পেশ করা হইল—

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند - با من و تو مردہ با حق زندہ اند

আগুন, পানি, বায়ু, মাটি সবই আল্লাহ তায়ালার অনুগত বান্দা; আমার ও তোমার পক্ষে ঐ শ্রেণীর বস্তুগুলি নির্জীব দেখাইলেও সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়লার পক্ষে ঐ সবগুলিই জীবন্ত!

---

* যেমন একটি লোক লাহোর হইতে খুলনা বা ফরিদপুরের দিকে যাত্রা করিলে বলা যাইতে পারে যে, সে ঢাকার আওতারে যাইতেছে, যেহেতু খুলনা ফরিদপুর এক একটি কেন্দ্র যাহা রাজধানী ঢাকার পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ..... ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ

"আর তোমরা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য—সর্ব্ব প্রকারের নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলী হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিও ঐ সবের ধারে-কাছেও যাইও না।.....এই সব আদেশ-উপদেশ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন যেন তোমাদের কার্য্যকলাপে বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ( ৮ পারা ৬ রুকু )

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.....

"আপনি জগৎবাসীকে জানাইয়া দিন, আমার প্রভু-পরওয়ারদেগার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলীকে হারাম ও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ( ছুরা আ'রাফ—৮ পারা ১১ রুকু )

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা কর্ত্তৃক নির্লজ্জ শালীনতাহীন ফাহেসা কার্য্যাবলী হারাম ও নিষিদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে সে সম্পর্কে হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—

**১৯১৮। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাল (দঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শালীনতা বিবর্জ্জিত নির্লজ্জ ফাহেসা কার্য্যকলাপকে আল্লাহ তায়ালা সকলের চেয়ে অধিক ঘৃণা করিয়া থাকেন। সে জন্যই আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার ফাহেসাকে হারাম করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তায়ালা প্রশংসাকে সর্ব্বাধিক ভাল বাসিয়া থাকেন। তাই আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং নিজের প্রশংসা করিয়াছেন।

**ব্যাখ্যা ঃ**—বর্ত্তমান জগতে শালীনতাহীন নির্লজ্জ ফাহেসা কার্য্যকলাপই হইল শিক্ষা ও সভ্যতার নিদর্শন এবং উহাই হইল বিভিন্ন মহল ও জল্‌সা-জুলুসের উৎকর্ষ সৌন্দর্য্য ও উজ্জলতা বর্দ্ধণকারী। এমনকি আর্ট ও শিল্প ইত্যাদি নামের অঙ্গভঙ্গী, নৃত্য-গীত ও ফাহেসাবাজীকে জাতীয় উন্নতির উৎস বলা হইয়া থাকে। সরকারী বাজেটে মোটা মোটা অঙ্ক উহার জন্য বরাদ্দ করা হইয়া থাকে।

আল্লার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরওয়া যাহারা করে না—যাহারা আল্লাহতে অবিশ্বাসী অমোসলেম তাহাদের পক্ষে উহা সম্ভব বটে, এবং সাধারণতঃ আল্লাহ তায়ালাও তাহাদের পক্ষে ইহজগতে উহা বরদাশ্‌ত করিয়া থাকেন। কিন্তু যাহারা মোসলমান তথা আল্লার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরওয়া করার বন্দনে আবদ্ধ তাহাদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার ঐরূপ ঘৃণিত ফাহেসা কার্য্যাবলী অবশ্যই কলঙ্কময়! তিনি তাহাদের পক্ষে অনেক সময় উহা বরদাশত করেন না। ফলে তাহারা আল্লার গজবে নিপতিত হয়।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে নিজেরা খোদা-ভক্ত মোত্তাকী পরহেজগার। কিন্তু তাহাদের ছেলে-মেয়েরা তাহাদেরই খরচায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় সেই শিক্ষা ও পরিবেশে প্রতিপালীত হইতেছে যাহা ঐ নির্লজ্জ ফাহেসা আদৎ-অভ্যাসের মূল উৎস ও সূত্র। নিজ পৃষ্ঠপোষকতায় ছেলে-মেয়েদিগকে আল্লাহ তায়ালার ঘৃণিত কার্য্যাবলী—নির্লজ্জ ফাহেসা আদৎ-অভ্যাসের আলয়ে প্রতি পালন করিয়া আল্লাহ-ভক্ত কিরূপে হওয়া যায় তাহা বাস্তবিকই বিবেচ্য বিষয়।

● আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"ক্ষমাগুণ ধারণ কর, সৎ কাজের আদেশ কর এবং অজ্ঞ লোকদের (বিরক্তিজনক ব্যবহার) হইতে দৃষ্টি এড়াইয়া চল।"

১৯১৯। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবীকে আদেশ করিয়াছেন—লোকদের অসদাচরণ ক্ষমা করার জন্য। মানবকে এই চারিত্রিক গুণ অর্জ্জনে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা উক্ত আয়াত নাযেল করিয়াছেন।

১৯২০। **হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি মসজিদে নামায পড়িতেছিলাম, এমতাবস্থায় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমার নিকট দিয়া যাইবার কালে আমাকে ডাকিলেন। (আমি যেহেতু নামাযে ছিলাম, তাই) আমি তাঁহার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হইলাম না। নামায শেষ করিয়া তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হযরত (দঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কেন আস নাই? আমি আরজ করিলাম ইয়া রসূলুল্লাহ! আমি নামায পড়িতে ছিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, তোমার লক্ষ্য নাই যে, আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

يا يها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم

"হে মোমেনগণ। আল্লাহ এবং রসুল তোমাদিগকে ডাকিলে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিও" (আবু সায়ীদ বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইন্‌শা আল্লাহ্ এই ত্রুটি পুনরায় কখনও করিব না।)

তারপর হযরত (দঃ) বলিলেন, মসজিদ হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই তোমাকে কোরআন শরীফের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছুরা কোনটি তাহা বাতলাইয়া দিব। অতঃপর নবী (দঃ) আমার হাত ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। মসজিদ হইতে বাহির হইবার নিকটবর্ত্তী

হইলে আমি তাঁহার ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেন, সেই ছুরাটি হইল "আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহে রাব্বিল-আলামীন"। যাহা বিশেষরূপে আমাকেই দান করা হইয়াছে, (অন্য কোন আসমানী কেতাবে এই ছুরা ছিল না।) এই ছুরাকেই কোরআনে-আজীম (কোরআনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অংশ) এবং সাব্‌য়েঃ মাছানী (সপ্ত আয়াতবিশিষ্ট পুনঃ পুনঃ পঠিত) নামে (১৪ পারা—ছুরা হেজর ৬ রুকুতে) আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

**ব্যাখ্যা ঃ**—আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

অর্থাৎ ঃ—হে মোমেনগণ! আল্লাহ এবং আল্লার রসুল যে সব বিধানাবলী ও কার্য্যাবলীর প্রতি আহ্বান করেন, বস্তুতঃ উহা তোমাদের ভবিষ্যৎ চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে শান্তি ও সাফল্য আনয়নকারী। অতএব আল্লাহ এবং রসুল যখন তোমাদিগকে চিরস্থায়ী শান্তির জিন্দেগী দানকারী কার্য্যের প্রতি আহ্বান করেন তোমরা সেই ডাকে সাড়া দাও। (ছুরা আন্‌ফাল—৯ পারা ১৭ রুকু)

পুর্ব্বাপর বিষয়-বস্তু দৃষ্টে এই আয়াতের মূল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের আদেশ-নিষেধকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা। সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা এবং কোন কাজ কঠিন বোধ হইলেও বিনা দ্বিধায় উহাতে আত্মনিয়োগ করা।

আলোচ্য হাদীছে দেখানো হইয়াছে, উক্ত আয়াতের আদেশটি কত কঠোর এবং ব্যাপক! রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জীবদ্দশায় তিনি কোন ব্যক্তিকে সাধারণ ভাবে ডাকিলেও সেই ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল এবং উহাও এই আয়াতের বিধানভুক্ত ছিল। এমনকি নামাযরত থাকিলেও নামায ছাড়িয়া রসুলের ডাকে অবিলম্বে সাড়া দেওয়া অত্যাবশ্যক ছিল।

**১৯১। হাদীছ ঃ**—(৯ পাঃ ১৮ রুঃ ছুরা আনফাল ৩২নং আয়াত যাহার অর্থ) "একটি স্মরণীয় কথা—কাফেররা বলিল, আয় আল্লাহ! এই ইসলাম ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, তোমার পক্ষ হইতে হয় তবে (ইহার বিরোধিতার শাস্তি দানে) আমাদের উপর আকাশ হইতে পাথর বর্ষণ কর বা অন্য কোন প্রকার ভীষণ আজাব পতিত কর।"

আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এই উক্তিকারক মূলতঃ আবুজহল ছিল (অন্যান্যরা উহাতে সায় দানকারী ছিল।)

উহার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা পরবর্ত্তী ৩৩নং আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যাহার অর্থ—"(হে হাবীব!) আপনি তাহাদের মধ্যে থাকাবস্থায় আল্লাহ তাহাদেরে এই শ্রেণীর আজাব দিবেন না। এবং তাহাদের মধ্যকার কিছু সংখ্যক লোক

(যথা—মোমেনগণ) ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকাবস্থায়ও তাহাদের উপর এই শ্রেণীর আজাব আসিবে না।

পরবর্ত্তী ৩৪নং আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের অপরাধ দৃষ্টে বস্তুতঃ তাহারা ঐরূপ আজাবেরই যোগ্য ছিল। উক্ত আয়াতের অর্থ এই "তাহাদেরে আল্লাহ আজাব কেন দিবেন না? তাহারা ত হরম শরীফের মসজিদ হইতে (মুসলমানদিগকে) বাধা দিয়া থাকে, (যেরূপ ষষ্ঠ হিঃ সনে হোদায়বিয়ার ঘটনায় করিয়াছে; তৃতীয় খণ্ড দ্রষ্টব্য।) অথচ তাহারা ঐ মসজিদের বন্ধু নহে। ঐ মসজিদের বন্ধু ত একমাত্র মোত্তাকী—মোমেনগণ। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বোকা।

১৯১২। হাদীছ ঃ—ছায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাদের নিকট তশরীফ আনিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ফেৎনা-ফাছাদ দুরীভূত করার জন্য আবশ্যক হইলে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে আপনি কিরূপ মনে করেন—সঙ্গত কি না?

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি ফেৎনার অর্থ বুঝ কি? অতঃপর তিনি নিজেই উহার বর্ণনা দিলেন—ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে বা করিতে চাহিলে কাফেররা তাহাকে মারপিট করিত, আবদ্ধ করিয়া রাখিত, এইরূপে ইসলাম গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হইত। পবিত্র কোরআনে ঐ অবস্থাকে "ফেৎনা" বলা হইয়াছে। উহা বন্ধ করার জন্য রসুলুল্লাহ (দঃ) কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ করিতেন। তোমরা বর্ত্তমানে ক্ষমতা লাভের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হও এবং উহাতে ফাছাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। (পবিত্র কোরআনে উল্লেখিত) "ফেৎনা" শব্দ দ্বারা উহা মোটেই উদ্দেশ্য নহে।

ব্যাখ্যা ঃ—মোসলমানদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় বিষয় নিয়া মতবিরোধ সৃষ্টি হইল এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্য্যন্ত ঘটিতে লাগিল তখন ছাহাবীদের মধ্যে অনেকেই নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিলেন; তন্মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)ও ছিলেন। আর এক দল লোক ঐ অবস্থায় নিরপেক্ষতাবাদের বিরোধী ছিলেন। তাঁহাদের মতে কোন একটি দলকে সমর্থন করিয়া উহার বিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের মতের সমর্থনে এই আয়াত পেশ করিতেন—وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ "শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাও যাবৎ না ফেৎনা-ফাছাদ দুরীভূত হইয়া যায়।

উক্ত দলেরই এক ব্যক্তি ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে এই আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাই তিনি এই আয়াতের "ফেৎনা" শব্দের ব্যাখ্যা দান করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা এই আয়াতের

উদ্দেশ্য মোটেই নহে। এই আয়াতের তাৎপর্য্য হইল কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া যাবৎ না ইসলামে বাধা দানের ক্ষমতা লোপ পাইয়া আল্লার দ্বীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

**১৯২৩। হাদীছ ঃ**—নাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে (মোসলমানদের পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের নীতি ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে) বলিল, আপনি এই আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেন না?

আল্লাহ বলিতেছেন..... وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

"মোসলমানদেরই দুইটি দল পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত হইলে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দাও। (মীমাংসার বা মীমাংসা-প্রচেষ্টার পরও) যদি এক দল আর এক দলের উপর অন্যায় চালাইতে চায় তবে উক্ত দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।" (ছুরা হুজুরাত—২৪ পারা ১৪ রুকু)। অর্থাৎ মীমাংসা করিতে না পারিলে এক দলে যোগদান করিয়া অপর দলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শামিল হউন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, দেখ ভাই! কোরআন শরীফে আরও একটি আয়াত আছে—..... وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

"যে ব্যক্তি কোন মোমেনকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করিবে তাহার শাস্তি হইবে জাহান্নাম, তথায় সে অনির্দিষ্টকাল থাকিবে এবং আল্লার গজব ও লা'নৎ তাহার উপর পতিত হইবে এবং আল্লাহ তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন।" (৫ পা ১০ রুঃ)

আবদুল্লাহ (রাঃ) ইহাও বলিলেন, প্রথম আয়াতটি বুঝিতে কোন রকম ভুল করিয়া দ্বিতীয় আয়াতটির দরুন মোসলমানের বিরুদ্ধে মারামারি কাটাকাটি হইতে বিরত থাকা আমার মতে দ্বিতীয় আয়াতটিতে ভুল করিয়া প্রথম আয়াতের দরুন ঐরূপ কাটাকাটিতে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি আর একটি আয়াত তাঁহার সামনে পেশ করিল— وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ "সংগ্রাম চালাইয়া যাও যাবৎ না ফেৎনা-ফাছাদ দূরীভূত হয়।" আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতের আদেশ মোতাবেক ত আমরা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যুগে কাজ করিয়াছি—যখন ইসলামের শক্তি কম ছিল। লোকদিগকে দ্বীন-ইসলামের কারণে নিপীড়িত হইতে হইত। কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে কাফেররা তাহাকে প্রাণে বধ করিত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার নির্য্যাতন চালাইত। ইসলাম গ্রহণে এইরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকেই উক্ত আয়াতে "ফেৎনা" বলা হইয়াছে। আমরা

উক্ত আয়াতের নির্দ্দেশে কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছি, যাহাতে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে—ফলে ইসলামে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রয়াস দুরীভূত হইয়া গিয়াছে। আর তোমরা যেই পথ অবলম্বন করিয়াছ উহাতে ত পুনরায় ফেৎনার উৎপত্তি হইবে। (কারণ, পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে মোসলমানদের শক্তি খর্ব্ব হইয়া তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। ফলে কাফেরেরা পুনরায় ইসলামে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিতে প্রবল হইয়া পড়িবে।

ঐ ব্যক্তি উক্ত বিতর্কে ব্যর্থ হইয়া অন্য একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিল যে, আপনি ওসমান (রাঃ) এবং আলী (রাঃ) সম্পর্কে কি বলেন? তদুত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁহারা উভয়েই যে, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও মর্য্যাদাশীল তাহা ব্যক্ত করিলেন।

**১৯২৪। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যখন এই আয়াত নাযেল হইল ঃ—

إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ

"(হে মোসলমানগণ! কাফেরদের মোকাবিলায়) তোমাদের বিশজন ধৈর্য্যশীল থাকিলে, দুই শত কাফেরের উপর জয়ী হইতে পারিবে, (১০ পারা ৫ রুকু)। এই আয়াতের ইঙ্গিত ছিল, মোসলমান তাহাদের দশ গুণ বেশী কাফের তথা দশজনের মোকাবিলায় একজন হইলেও স্থিরপদ থাকা ফরজ হইবে পলায়ন করিতে পারিবে না। মোসলমানগণ এই বিধানটি গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কঠিন বোধ করিলেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা উহার পরবর্ত্তী আয়াত নাযেল করিলেন—

اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا - فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ -

"এখন হইতে আল্লাহ তায়ালা (পূর্ব্বের বিধান) তোমাদের পক্ষে সহজ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্যে সাহসের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়াছেন। এখন তোমাদের এক শত জন ধৈর্য্যশীল থাকিলে দুই শতের উপর জয়ী হইবে।" অর্থাৎ দ্বিগুণের মোকাবিলা হইতে পশ্চাদপসারণ জায়েয হইবে না। তার অধিক হইলে প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টা করা জায়েয হইবে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই প্রসঙ্গে বলেন, দশগুণ হইতে কম করিয়া দ্বিগুণ করতঃ সহজ করায় সেই পরিমাণে ধৈর্য্যশক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে মোসলমানদের যে ধৈর্য্যশক্তি ছিল এখন উহার দশ ভাগের আট ভাগ কমিয়া গিয়াছে।

**১৯২৫। হাদীছ ঃ**—খালেদ ইবনে আসলাম বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে পথ চলিতে ছিলাম, এক গ্রাম্য ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, আমাকে এই আয়াতটির তাৎপর্য্য বলিয়া দিবেন কি ?

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - يَوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ -

"যে সমস্ত লোক সোনা-চান্দি ( তথা ধন-সম্পদ ) জমা করিয়া রাখে, উহা আল্লার রাস্তায় খরচ করেনা তাহাদিগকে ভীষণ আজাবের সংবাদ জ্ঞাত করিয়া রাখুন। তাহাদের সোনা-চান্দি ( বা ধন-সম্পদের মূল্য পরিমাণ সোনা-চান্দিকে পাতরূপে রূপান্তরিত করিয়া ঐগুলিকে ) জাহান্নামের আগুনে গরম করা হইবে। অতঃপর উহা দ্বারা ঐ ধন-সম্পদের মালিকদিগকে দাগ লাগান হইবে—তাহাদের কপালে, পাঁজরে ও পিঠে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, এই সব ধন-সম্পদ যাহা তোমরা ( আল্লার রাস্তায় খরচ না করিয়া ) নিজের জন্য জমা করিয়া রাখিয়া ছিলে। সুতরাং যাহা নিজের জন্য জমা করিয়াছিলে উহার মজা ভোগ কর।"

( ছুরা তওবাহ্—১০ পারা ১১ রুকূ )

এই আয়াত-মর্ম্মে বুঝা যায় নিজ ব্যয়ের অবশিষ্ট ধন-সম্পদ সবটুকুই আল্লার রাস্তায় ব্যয় করিতে হইবে, নতুবা আজাব হইবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, আয়াতের উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যে অবশিষ্ট সম্পূর্ণ ধন-সম্পদ জমা করিয়া রাখে—উহার যাকাতও দেয় না, আজাব তাহারই হইবে।

আলোচ্য আয়াত নাযেল হওয়ার পরে যাকাতের ( তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বাধ্যতামূলক আল্লার রাস্তায় খরচ করার ) বিধান প্রবর্ত্তন করিয়া ঐ যাকাতকে আল্লাহ তায়ালা অবশিষ্ট মালের পবিত্রকারী করিয়া দিয়াছেন।

**১৯২৬। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মোমেনদের সঙ্গে আল্লাহ তায়ালার একটা বিশেষ গোপন আলাপ-অনুষ্ঠান হইবে। উহার বিবরণ আমি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি—তিনি বলিয়াছেন, মোমেন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ( আহ্বানে তাঁহার ) দরবারে উপস্থিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে তাঁহার বিশেষ রহমতের বেষ্টনীর আড়ালে রাখিয়া তাহার গোনাহ সমূহের স্বীকারোক্তির পরীক্ষা লইবেন—আল্লাহ তায়ালা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, অমুক গোনাহ

তোমার স্মরণ আছে কি? অমুক গোনাহ তোমার স্মরণ আছে কি? ঐ ব্যক্তি উত্তরে বলিতে থাকিবে, হাঁ—প্রভু! আমার এই অপরাধ হইয়াছে। আমার এই অপরাধ হইয়াছে। এইভাবে আল্লাহ তায়ালা তাহার গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করিবেন। ঐ ব্যক্তি মনে মনে তাহার বিপদ গণিবে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার অপরাধ গোপন রাখিয়াছিলাম। আজিকার দিনেও আমি তোমার সব গোনাহ মাফ করিয়া দিলাম। অতঃপর (থাকিবে শুধু তাহার নেকের আমল-নামা,) তাহার নেকের আমল নামা ভাঁজ করিয়া তাহার হাতে দেওয়া হইবে। (এইভাবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতে হিসাবের দিন মোমেনদের সম্পর্কে গোপনতা অবলম্বন করিয়া তাহাদিগকে অপমান হইতে রক্ষা করিবেন)। পক্ষান্তরে অপর দল তথা আল্লাদ্রোহীদেরে সকলের সম্মুখে দেখাইয়া দিয়া (নেক-বদের) সাক্ষ্যদাতা ফেরেশতাগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া বেড়াইবেন—

هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ - اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

"এই লোকগুলি তাহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার সম্পর্কে মিথ্যা ও ভুল পথের পথিক ছিল। সকলে শুনিয়া রাখ, এই অনাচারী ও স্বেচ্ছাচারীদের উপর আল্লার লা'নত পতিত হইবে।" (ছুরা হুদ—১২ পারা ২ রুকু)

**১৯২৭। হাদীছঃ**—আবু মুছা আশ্‌য়ারী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা জালেম—অন্যায়কারীকে (পরীক্ষার স্থল দুনিয়াতে) অবকাশ দিয়া থাকেন। কিন্তু যখন ধরেন এবং পাকড়াও করেন তখন আর ছাড়েন না। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ...

"(হযরত নূহের জাতি, হযরত হুদের জাতি, হযরত ছালেহের জাতি, হযরত লুতের জাতি, হযরত শোয়ায়েবের জাতি, হযরত মুছার জাতি—এই সব জাতির ধ্বংসের বিস্তারিত ইতিহাস বর্ণনা করিয়া আল্লাহ তায়ালা বলেন,) এইভাবেই তোমার প্রভু পাকড়াও করিয়া থাকেন যখন তিনি কোন স্বেচ্ছাচারী অনাচারী অঞ্চলবাসীকে পাকড়াও করেন। নিশ্চয় তাঁহার পাকড়াও অতিশয় ভয়ঙ্কর ও কঠোর। ইহাতে নছিহত ও শিক্ষা রহিয়াছে। ঐ লোকদের জন্য যাহারা আখেরাতের আজাবকে ভয় করে।" (ছুরা হুদ—১০ পারা ৯ রুকু)

**১৯২৮। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন মক্কায় লুকাইয়া জেন্দেগী কাটিতে ছিলেন তখন তিনি ছাহাবীগণকে লইয়া জামাতে নামায পড়া কালে সজোরে কেরাত পড়িয়া থাকিতেন। মোশরেকগণ উহা শুনিয়া কোরআনকে কোরআনের অবতরণকারীকে এবং কোরআনের বাহককে গালি দিত, তাই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযেল করিলেন—

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا -

"নামাযের কেরাত অতি জোরেও পড়িবেন না, (যাহাতে কাফেরগণ উহা শুনিয়া কোরআনকে গালি দেয়।) একেবারে আস্তেও পড়িবেন না, (যাহাতে ছাহাবীগণ শুনিতে না পারে।) উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পন্থায় পড়িবেন।

**১৯২৯। হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها—দোয়া করার নিয়ম এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।

**১৯৩০। হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা(রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন এই শ্রেণীর অনেক লোক উপস্থিত হইবে যাহারা পার্থিব জীবনে মোটা মোটা দেহবিশিষ্ট বড় বড় পদবীধারী ছিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট তাহাদের ওজন (ও মর্য্যাদা) মাছির ডানা সমতুল্যও হইবে না।

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنا

**ব্যাখ্যা ঃ**—আলোচ্য হাদীছের আয়াতটি ছুরা কাহাফের শেষ দিকের আয়াত। আয়াতের বর্ণনা হইল, পারলৌকিক জীবনে সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত লোক তাহারা যাহাদের ইহকালীন উদ্যম ও ভাল কাজসমূহ যদ্দ্বারা তাহারা আত্মতুষ্টিও লাভ করিয়া থাকিত—আখেরাতের সঙ্কটময় জীবনে তাহাদের ঐ সব কাজ ও আমল নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইবে। সেই লোকদের পরিচয় ও পরিণতি বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন—

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا - ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا

وَاتَّخَذُوْٓا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا -

"ঐ লোকগণ তাহারা—যাহারা স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিদর্শন সমূহ তথা রসুল ও কোরআনকে অস্বীকার করে এবং পরওয়ারদেগারের নিকট হাজেরী তথা হিসাব-নিকাশের জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিতিকে অস্বীকার করে, ফলে তাহাদের সমুদয় আমল নিষ্ফল সাব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কেয়ামতের দিন তাহাদের এবং তাহাদের আমলের কোন ওজনই আমি দিব না। তাহাদের পরিণতি হইবে জাহান্নাম। এই কারণে যে, তাহারা আমার (কালামের) আয়াত সমূহকে এবং আমার রসুলগণকে উপেক্ষা ও উপহাস করিত।"

**১৯৩১। হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (চিরস্থায়ীরূপে) বেহেশতীগণ বেহেশতে এবং দোযখীগণ দোযখে যাওয়ার পর মৃত্যুকে একটি সাদা-কালো চিত্রাঙ্গ ভেড়ার আকৃতিতে (বেহেশত-দোযখের মধ্যস্থলে) উপস্থিত করা হইবে এবং একজন ফেরেশতা ডাকিবেন—হে বেহেশতবাসীগণ! তখন সকল বেহেশতবাসী সেই দিকে তাকাইবেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, ইহাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহারা সকলেই বলিবেন, হাঁ—ইহা মৃত্যু। এইরূপে দোযখীদেরকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইবে। তাহারাও ঐ উত্তরই দিবে। অতঃপর সকলের চোখের সামনে উহাকে জবাহ্ করা হইবে এবং ঘোষণা করা হইবে—হে বেহেশতবাসীগণ! তোমরা অনন্তকাল বেহেশতের সুখ ভোগ করিতে থাকিবে, মৃত্যু আসিবে না। হে দোযখবাসী! তোমরা চিরকাল দোযখে আজাব ভোগ করিতে থাকিবে আর মৃত্যু আসিবে না। এই ঘোষনায় বেহেশতীদের আনন্দ উল্লাস বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে দোযখীদের দুঃখ-ভাবনা ও আক্ষেপ-অনুতাপ অধিক বাড়িয়া যাইবে। এই বিবরণ দান উপলক্ষে হযরত (দঃ) এই আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন—

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

"আপনি লোকদিগকে সতর্ক করুণ—আক্ষেপ ও অনুতাপের দিন সম্পর্কে যে দিন চিরস্থায়ী শেষ ফয়ছালা করিয়া দেওয়া হইবে। তাহারা (আজ এই কার্য্য ক্ষেত্রে) অবহেলায় বিভোর রহিয়াছে এবং ঈমান গ্রহণ করিতেছে না। (সেই দিন ইহার পরিণাম ভোগ করিবে।") (ছুরা মরয়াম—১৬ পারা)

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত দোযখীদের অসীম আক্ষেপ-অনুতাপের ঘটনা সম্বলিত কেয়ামতের দিনকেই উক্ত আয়াতে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

**১৯৩২। হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন মানুষ এরূপ ছিল যে, (ইসলাম গ্রহণ করিয়া হযরত রসুলুল্লার (দঃ)

নিকট) মদীনায় আসিয়া পড়িত। অতঃপর যদি দেখিত, তাহার স্ত্রী ছেলে সন্তান জন্ম দিয়াছে, ঘোড়া (ইত্যাদি পশু) বাচ্চা দিয়াছে (অর্থাৎ যদি জাগতিক উন্নতি দেখিত) তবে বলিত, ইসলাম ধর্ম্ম খুব ভাল ধর্ম্ম। আর যদি ঐ সব না দেখিত তবে বলিত ইসলাম ধর্ম্ম ভাল ধর্ম্ম নয়। তাহাদের ভয়াবহ পরিণতির ইঙ্গিত দান করিয়াই এই আয়াত নাযেল হয়—

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ - فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرٌ نِ اطْمَاَنَّ بِهٖ - وَاِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ - خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ - ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ -

"এক শ্রেণীর লোক এরূপ যে, তাহারা আল্লার বন্দেগী (যথা ইসলাম অবলম্বন) করে এইরূপে যেন সে (নৌকা ইত্যাদিতে আরোহণ করিয়াছে, কিন্তু দীর্ঘ সময় উহাতে অবস্থানের নিয়্যতে আসে নাই বলিয়া ভিতরে বসে না,) কিনারায় দাঁড়াইয়া আছে (—যে কোন মূহূর্ত্তে উহা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে)। যদি উহাতে সুযোগ-সুবিধা ও লাভ দেখিতে পায় তবে (সেই স্বার্থের জন্য) উহাতে অবিচল থাকিবে। আর কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হইলে (তথা কোন ক্ষয়-ক্ষতি বা দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখিলেই) উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। এই শ্রেণীর লোকগণ দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই হারায় এবং ইহা হইতেছে পূর্ণ ক্ষতি।" (১৭ পারা ৯ রুকু)

**১৯৩৩। হাদীছ ঃ—** ছফিয়া-বিন্‌তে-শায়বাহ্ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) বলিয়া থাকিতেন, পবিত্র কোরআনে আছে—

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

"স্ত্রী লোকদের অবশ্য কর্ত্তব্য, (গায়ের জামা দ্বারা বুক ঢাকা থাকা সত্ত্বেও ঐ অংশের বিশেষ পর্দ্দার জন্য) মাথার ওড়্না দ্বারা বুক দোহ্‌রারূপে ঢাকিয়া রাখিবে, (যেন উহার আকার আকৃতিও ভাসিয়া না থাকে।) (১৮ পারা ১০ রুকু)

এই আয়াতটি নাযেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোসলমান রমণীগণের মধ্যে—যাহাদের ওড়্নার সুব্যবস্থা ছিল না তাহারা তাহাদের চাদরের এক পার্শ ছিড়িয়া-ফাড়িয়া ওড়্না তৈরী করতঃ উহা দ্বারা মাথা ঢাকিল এবং বুকের উপর দোহ্‌রা পর্দ্দাও করিল।

**১৯৩৪। হাদীছ ঃ—**ছাহাবী আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, পবিত্র কোরআনের আয়াত— اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ -

"(কেয়ামতের দিন ঈমানহীন লোকদের অবস্থা এই হইবে যে, ) তাহাদিগকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করা হইবে তাহাদের মুখের উপর।" (১৯ পারা ১ রুঃ)

এক ব্যক্তি উক্ত আয়াতের মর্ম্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল—হে আল্লার নবী! কাফেরকে কেয়ামতের দিন মুখের উপর তাড়াইয়া নেওয়া হইবে কিরূপে? হযরত নবী (দঃ) উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষকে দুই পায়ের উপর চালাইতেছেন। তিনি কি কেয়ামতের দিন মুখের উপর চালাইতে সক্ষম হইবেন না? ঐ ব্যক্তি বলিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়—আমাদের প্রভুর শক্তিমত্ত্বার শপথ করিয়া স্বীকার করিতেছি, নিশ্চয় পারিবেন।

**১৯৩৫। হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পালক পুত্র যায়েদ-ইবনে-হারেসা (রাঃ)কে আমরা সকলেই যায়েদ-ইবনে-মোহাম্মদ—মোহাম্মদের পুত্র বলিয়া থাকিতাম, যাবৎ না এই আয়াত নাযেল হইল ...... ادعوهم لآبائهم

**ব্যাখ্যা :**—আরব দেশে পালক পুত্রকে পালনকারী পিতার পুত্র নামে আখ্যায়িত করা হইত। এই আখ্যার উপর নির্ভর করিয়া কতকগুলি কুপ্রথাও তাহাদের মধ্যে প্রতিপালিত হইত—পালনকারীর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ঐ পালক পুত্রের সমুদয় আচার ব্যবহার পুরাপুরিভাবে প্রকৃত মা ও ভাই-বোনদের ন্যায় হইয়া থাকিত। তাহাকে কোন স্তরেই বেগানা পুরুষ গণ্য করা হইত না। উত্তরাধীকার সম্পর্কেও তাহারা প্রকৃত পিতা-পুত্ররূপে গণ্য করিত। পালক পুত্র-বধূকে পালনকারী পিতার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে পুত্র-বধূ গণ্য করা হইত। ফলে এক দিকে পুত্র-বধূর জন্য ঐ পিতাকে বেগানা পুরুষ গণ্য করা হইত না। অপর দিকে ঐ পুত্র-বধূকে পালনকারী পিতার জন্য প্রকৃত পুত্র-বধূর ন্যায় চির-হারাম গণ্য করা হইত—পুত্রের বিবাহ মুক্ত হওয়ার পরও ঐ পিতার সঙ্গে বিবাহ অবৈধ মনে করা হইত। উল্লেখিত কুপ্রথাসমূহ ইসলামে রহিত করার ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে এবং ঐরূপ কঠোর ভাবে প্রতিপালিত ও প্রচলিত প্রথা কার্য্যতঃ ভঙ্গ করিয়া না দেখাইলে শুধু কথায় ভঙ্গ হইবে না।

স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহ আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে একটা সুযোগ আসিল—তাঁহার পালক পুত্র যায়েদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর স্ত্রী ছিলেন জয়নব (রাঃ)। তাঁহাদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিল। এই উপলক্ষে স্বয়ং হযরত (দঃ) পালক পুত্র-বধূ জয়নবকে বিবাহ করিয়া ঐ সব কুপ্রথার মূল উচ্ছেদের একটা সুযোগ দেখিলেন এবং সেই বিবাহ করা মনে মনে স্থির করিলেন, কিন্তু তিনি লোক-মুখে কুৎসা রটনার ভয় করিতে ছিলেন। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উক্ত বিবাহ

কার্য্য সমাধা করিয়া ফেলার ইঙ্গিত আসিল। এমনকি, কাহারও মতে অহি মারফৎ আল্লাহ তায়ালাই বিবাহ সম্পন্ন করিয়া দিলেন। পরিণামে তাহাই ঘটিল যাহার আশঙ্কা হযরত (দঃ) করিতে ছিলেন। পুত্র-বধূ বিবাহ করার বদনামীর ঝড় বহিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, বরং নানারকম অমূলক নোংরা আকথা কুকথাও মন-গড়ারূপে জড়িত হইয়া গেল। যাহা আজও শত্রুদের লেখায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সব ঝড়-তুফান প্রতিরোধ কল্পে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযেল হইল। প্রথমতঃ যুক্তি দেখান হইল—مَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

"তোমাদের মুখ-বলা পুত্রগণকে ত সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তায়ালা পুত্র বানান নাই। সুতরাং বিধি-বিধানে সে পুত্র বলিয়া কেন গণ্য হইবে? অতঃপর ঐ সব কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ কল্পে ঘোষনা দিলেন—

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"মুখ-বলা পালক পুত্রগণকে তাহাদের প্রকৃত পিতার সম্বন্ধ উল্লেখ করিয়া ডাক, বস্তুতঃ ইহাই সত্য কথা। যদি প্রকৃত পিতার সন্ধান না করিতে পার (তবুও পালনকারী পিতার সম্বন্ধ জড়াইয়া ডাকিও না, কারণ) ঐ পুত্র ত পালনকারীর জন্য বস্তুতঃ একজন মোসলমান ভাই বা ক্রীতদাস (ইত্যাদি)।"

**মছ্আলাহ ঃ**- শুধু মুখে মুখে কাহাকেও ছেলে বলা হইলে তাহা গোনার কাজ হইবে না বটে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ঐ ডাকের অছিলায় বেপর্দ্দা ও বেগানার সঙ্গে মেলামেশার গোড়া-পত্তন যেন না হইয়া বসে। যদি এইরূপ আশঙ্কা বা প্রচলন থাকে তবে ঐরূপ ডাকই নিষিদ্ধ হইবে।

**১৯৩৬। হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যায়েদ ইবনে হারেছার পরিত্যক্ত স্ত্রী জয়নব রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সম্পর্কেই হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্বোধন করিয়া এই আয়াত নাযেল হইয়াছে—تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

"(অনৈসলামিক কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ উদ্দেশ্যে জয়নবকে বিবাহ করার) সেই পরিকল্পনা আপনি গোপন ভাবে মনে মনে পোষন করিতে ছিলেন, যাহার বিকাশ আল্লাহ তায়ালাই স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলেন।" (ছুরা আহজাব—২২ পারা ২ রুকু)

**ব্যাখ্যা ঃ**—জয়নব (রাঃ) যিনি হযরত রসুলুল্লার (দঃ) ফুফুজাদ ভগ্নী ছিলেন। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল যায়েদ ইবনে হারেছা (রাঃ)-এর সঙ্গে। তিনি হযরতেরই

পালক পুত্র ছিলেন। এই বিবাহে হযরত (দঃ) মস্ত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা কাঁধে লইয়াছিলেন। জয়নব (রাঃ) ছিলন কোরায়েশ বংশীয়া এবং যায়েদ (রাঃ) তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী ক্রীতদাস ছিলেন। তাই বংশের সকল লোকই এই বিবাহে অসম্মত ছিল। একা হযরত (দঃ) এই বিবাহে উদ্যোগী ছিলেন। আর সকলেই এই ব্যাপারে তাঁহার বিরোধী ছিল। কিন্তু মোসলমানদের উপর রসুলের যে মর্য্যাদা ও হক সুরক্ষিত আছে উহার দ্বারা এই বিরোধও কোরআনের স্পষ্ট ঘোষনায় অবৈধ বলিয়া বিঘোষিত হইল—

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ - وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا

"আল্লাহ এবং আল্লার রসুল কোন বিষয়ে আদেশ প্রয়োগ করিলে অতঃপর কোন ঈমানদার পুরুষ বা নারীর পক্ষে ঐ বিষয় সম্পর্কে মতবিরোধ করিবার কোন অবকাশই থাকে না। যে কেহ আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের নাফরমানী করিবে অবশ্যই সে সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্টতায় পতিত বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।" ( ২২ পারা ২ রুকু)

এই ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিত সকলেই বিরোধিতা ত্যাগ করিলেন এবং হযরত (দঃ) বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিলেন। ভাগ্যের পরিহাস—যায়েদ (রাঃ) এবং জয়নব (রাঃ) তাঁহাদের মধ্যে মিল-মহব্বৎ মোটেই হইল না। বাধ্য হইয়া যায়েদ (রাঃ) অচিরেই জয়নব (রাঃ)কে ত্যাগ করার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু হযরত (দঃ) তাহাকে বুঝ-প্রবোধ দিয়া স্ত্রীকে বহাল রাখার পরামর্শ দিতে ছিলেন। উপস্থিত অবস্থা দৃষ্টে হযরত (দঃ) তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী দেখিলেন। তিনি এই বিবাহের গোড়ার ঘটনা স্মরণ করিলেন স্বাভাবিক ভাবেই এক্ষেত্রে নিজ দায়িত্বের দরুণ জয়নব (রাঃ) এবং তাঁহার সহোদরগণের মনঃদুঃখের প্রতিকার করার ভাবনা তাঁহার ( হযরত ) সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে হযরত (দঃ) মনে মনে একটা খেয়াল করিলেন—বিবাহ বিচ্ছেদ যখন হইয়াই যাইবে তখন জয়নবকে স্বয়ং হযরত (দঃ) নিজ বিবাহ বন্ধনে আনিয়া তাঁহাকে উম্মুল-মোমেনীন পদে ভুষিত করিবেন। এই অসাধারণ সম্মান লাভে জয়নব (রাঃ) এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গের যাবতীয় মনঃদুঃখ বিদুরিত হইয়া যাইবে। কিন্তু যায়েদ (রাঃ) যেহেতু হযরতের পালক পুত্র ছিলেন। তাই এই ব্যবস্থা গ্রহণে হযরত (দঃ) লোকদের কুৎসার ভয় করিতে ছিলেন যে, তাহারা বলিবে, মোহাম্মদ (দঃ) পুত্র-বধূকে বিবাহ করিয়াছে।

এদিকে উক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অন্য আর একটি দিক দিয়া হযরতেরও অভিপ্রেত ছিল, আল্লাহ তায়ালার নিকটও বিশেষ পছন্দনীয় ছিল। আরবের কুসংস্কার—

পালক পুত্রের বধূকে আপন পুত্রের বধূ গণ্য করা; ইসলামে ঐরূপ গর্হিত নীতির স্থান নাই। তাই উহাকে কঠোর হস্তে চুরমার করিতে হইবে। ইহার জন্য স্বয়ং রসুল মারফৎ কার্য্যতঃ ঐ কুসংস্কার ধ্বংসের আরম্ভ অত্যন্ত সমীচীন ও বিশেষ পছন্দনীয় ছিল, তাই আল্লার তরফ হইতে হযরতের প্রতি আদেশ হইল জয়নবকে বিবাহ করিয়া স্বীয় গোপন মনোভাবকে কার্য্যে পরিণত করার। এমনকি, যায়েদের সঙ্গে-জয়নবের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবার পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নিজ ব্যবস্থাপনায় হযরতের সঙ্গে জয়নবের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অহী মারফৎ বিবাহের খবর দিয়া দিলেন। হাদীছে বর্ণিত আছে—জয়নব (রাঃ) হযরতের অন্যান্য বিবিগণের উপর এই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন, তোমাদের বিবাহ-কার্য্য তোমাদের অলী-ওয়ারিস মুরব্বিগণ সম্পন্ন করিয়াছেন, আর আমার বিবাহ আল্লাহ তায়ালা আসমানের উপরে (ফেরেশতাদের মহফিলে) সম্পন্ন করিয়াছেন।

উল্লেখিত ঘটনা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণে পবিত্র কোরআনের আয়াতও বিদ্যমান রহিয়াছে, বক্ষ্যমান হাদীছের আয়াতটি উহারই অন্তর্গত—

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْٓ اَنْعَمَ اللّٰهُ.....وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا -

অর্থাৎ—"আপনি আপনার উপকারে ও সাহায্য-সহায়তায় প্রতি পালিত যায়েদকে পরামর্শ দিতে ছিলেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে বহাল রাখ, আল্লাহকে ভয় কর। ঐ অবস্থায় আপনি মনের ভিতরে একটা বিষয় গোপন রাখিতে ছিলেন যাহা আল্লাহ পাক প্রকাশ করিয়া দিবেন। আপনি লোকদের ভয় করিতেছিলেন, অথচ একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করাই শ্রেয়ঃ। তারপর জয়নব হইতে যায়েদের সম্পর্ক সমাপ্তি হইয়া গেলে আমি জয়নবকে আপনার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলাম—এই উদ্দেশ্য যে, মুখ-বলা ছেলেদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের বিবাহ বিচ্ছেদের পর ঐ ছেলেদের পালনকারী কর্ত্তৃক বিবাহ করার ব্যাপারে অন্ধকার যুগের প্রথার যে, প্রতিবন্ধক রহিয়াছে মোমেনদের পক্ষে যেন সেই প্রতিবন্ধক আর না থাকে। এবং ঐ বধূকে মাহ্‌রাম গণ্য করার যে সব হারাম ও নাজায়েয ফল ফলিয়া থাকে ঐ সবের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। আল্লাহ কর্ত্তৃক এই বিধান জারী হওয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারিত ছিল।"

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—আলোচ্য হাদীছে উল্লেখিত আয়াতে যে বলা হইয়াছে—"আপনি দিলের মধ্যে একটা বিষয় গোপন রাখিতে ছিলেন, ইহার প্রকৃত তফছীর পাঠকবর্গের সমক্ষে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হইল। বিশিষ্ট তফছীরকারকগণও এই তফছীরই লিখিয়াছেন। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন তথাকথিত তফছীরকারের লেখায় কতকগুলি অবাঞ্ছিত কথারও সমাবেশ দৃষ্টি গোচর হয়;

বস্তুতঃ উহা ইসলামের শত্রুদের গড়ান কাহিনী মাত্র, যাহা কোন কোন মোসলমানও নকল করিয়াছে। ঐ গুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন আপবাদ মাত্র।

**১৯৩৭। হাদীছ ঃ**— * সায়ীদ ইবনে জোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা (রঃ) আমাকে বলিলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে এই আয়াত দুইটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর—

وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ... (১)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ.....

"আখেরাতে নাজাত পাইবার শর্ত স্বরূপ কতিপয় গুণের উল্লেখ করতঃ বলা হইয়াছে—) এবং যাহারা এমন কোন নরহত্যা করে না যাহা না-হক এবং আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা হইয়াছে। (অতঃপর বলা হইয়াছে—) অবশ্য যাহারা তওবাকরিবে, ঈমান আনিবে এবং নেক আমল করিবে, তাহাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা তাহাদের পূর্ব্ব কৃত গোনাহ্‌গুলি মাফ করিয়া দিয়া উহার স্থলে ( নামায়ে-আমলের মধ্যে ) নেক আমল সমূহ লিখিয়া দিবেন ; আল্লাহ অতিশয় দয়ালু ক্ষমাশীল।„ ( ১৯ পারা ৪ রুকু )

এই আয়াতের মর্ম্মে বুঝা যায়, অবৈধ খুন বা নরহত্যাকারীর জন্যও তওবা করার এবং তওবা দ্বারা ঐ গোনাহ্‌ মাফ হওয়ার সুযোগ আছে।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا.....[২]

"যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার মোসলমান মানুষকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করিবে তাহার প্রতিফল ইহাই হইবে—সে চিরকালের জন্য জাহান্নামের আজাব ভোগ করিবে এবং তাহার উপর আল্লার গজব ও অভিশাপ পতিত হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ভীষণ আজাব প্রস্তুত রাখিয়াছেন!" ( ছুরা নেছা—৫ পারা ১০ রুকু )

এই আয়াতের মর্ম্মে বুঝা যায়, মোমেন মোসলমানকে হত্যাকারীর জন্য তওবা করিয়া গোনাহ মাফ করাইবার সুযোগ নাই। নতুবা চিরকাল দোযখ বাসের শাস্তি নির্দ্ধারিত হইবে কেন?

সায়ীদ (রঃ) বলেন, আমি উক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, আয়াত দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। ছুরা ফোরকানের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা আখেরাতের নাজাতের জন্য

---

* এই হাদীছটি ৫৪৪ পৃষ্ঠায় এবং ৭১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ হইয়াছে, উভয় স্থানের রেওয়ায়েত দৃষ্টে তরজমা করা হইল।

আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও পূজা না করা, ব্যভিচারে লিপ্ত না হওয়া, নরহত্যা না করা ইত্যাদির শর্ত আরোপ করিলে মক্কাবাসী কতিপয় মোশরেক কাফের রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আপনি যেই দ্বীন ও ধর্ম্মের প্রতি আহ্বান করেন তাহা খুবই ভাল। কিন্তু উহা দ্বারা আমরা ত নাজাত পাইতে পারিব না যেহেতু আমরা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের পূজা করিয়াছি, ব্যভিচার করিয়াছি, নরহত্যা করিয়াছি। এই শ্রেণীর লোকদের কথার উত্তরে আল্লাহ তায়ালা উক্ত ছুরা ফোরক্কানের মূল বিষয়-বস্তুটির সহিত এই কথাটি সংযোগ করিয়া দিলেন যে—"অবশ্য যাহারা তওবা করিবে....."। সুতরাং এই ছুরা ফোরক্কানের আয়াত ঐ লোকদের পক্ষে যাহারা অমোসলেম থাকাবস্থায় নরহত্যা ইত্যাদি করিয়াছিল পরে তাহারা তওবা করতঃ ঈমান ও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই শ্রেণীর লোকদের পূর্ব্বকৃত নরহত্যা ইত্যাদি গোনাহ মাফ হইয়া যাইবে। এই শ্রেণীর লোকদেরে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করণার্থে তাহাদের জন্য উদারতা ঘোষণা পুর্ব্বক আল্লাহ তায়ালা আরও বলিয়াছেন—

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ...

"হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি লোকদিগকে জানাইয়া দিন, আমি ঘোষণা দিতেছি—হে আমার ঐ সকল বান্দাগণ! যাহারা গোনাহ করিয়া নিজেদের উপর অত্যাচার করিয়াছ—তোমরা আল্লার রহমত হইতে নিরাশ হইও না; (তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিলে) নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তোমাদের (পূর্ব্বকৃত) সমুদয় গোনাহ মাফ করিয়া দিবেন। (ছুরা যুমার—২৪ পারা ৩ রুকু)

পক্ষান্তরে ছুরা নেছার আয়াত তথা নরহত্যার দায়ে চিরকাল দোযখ বাসের শাস্তি ঐ লোকদের পক্ষে যাহারা মোসলমান এবং ইসলামের বিধান অবগত হওয়া সত্তেও নরহত্যা করিয়াছে। তাহাদের সম্পর্কে ছুরা নেছার আয়াতের ঘোষনা যে—"তাহারা চিরকাল দোযখের শাস্তি ভোগ করিবে।"

বিশিষ্ট তাবেয়ী মোজাহেদ (রঃ) বলিয়াছেন ছুরা নেছায় বর্ণিত শাস্তি মোসলমান-হত্যা অপরাধের সমুচিত শাস্তির মূল ধারারূপে উল্লেখ হইয়াছে—শুধুমাত্র অপরাধটির কঠোরতা প্রকাশ করার জন্য। নতুবা এ স্থলে আর একটি উপধারাও আছে যাহার ফলে শরিয়ত নির্দ্ধারিত বিশেষ নিয়মে খাঁটী তওবা করিলে এই ক্ষেত্রেও দোযখের চিরস্থায়ী আজাব হইতে মুক্তির পথ রহিয়াছে।

**১৯৩৮। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা ইহুদীদের এক বড় পণ্ডিৎ হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সমীপে

আসিয়া বলিল, আমরা তৌরাত কেতাবে দেখিতে পাই, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সমুদয় আসমানগুলিকে এক আঙ্গুলের উপর, ভূমণ্ডলের স্থল ভাগকে এক আঙ্গুলের উপর, পাহাড়-পর্ব্বত ও বৃক্ষরাজি এক আঙ্গুলের উপর, পানি ও কাঁদা তথা ভূমণ্ডলের জল ভাগকে এক আঙ্গুলের উপর এবং অন্য সব সৃষ্টকে এক আঙ্গুলের উপর রাখিবেন; অতঃপর (এই সবগুলির সমষ্টিও যে আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও ক্ষমতার সম্মুখে অতি নগণ্য তাহা প্রকাশকরণার্থে ঐ বহনকারী) আঙ্গুল সমূহকে নাড়াচাড়া ও আন্দোলিত করতঃ বলিতে থাকিবেন, আমিই সর্ব্বাধিপতি আমিই সর্ব্বাধিপতি। *

ইহুদী পণ্ডিতের উক্তি সমর্থন করার ভঙ্গিতে হযরত (দঃ) হাসিয়া উঠিলেন এবং (ইহুদীগণ আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্ব জানিয়া শুনিয়াও আল্লাহ সম্পর্কে অবাঞ্ছিত উক্তি করিয়া থাকে—তাহারা ওযায়ের নবীকে আল্লার পুত্র বলিয়া থাকে। আল্লার রসুলকে অমান্য করিয়া চলে ইত্যাদি ইত্যাদি। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সবের উপর তাহাদের প্রতি তিরস্কার স্বরূপ) এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ

"আল্লাহ তায়ালার মহত্ত্বের যেরূপ মূল্য দান করা আবশ্যক কাফেরগণ ও মোশরেকগণ সেইরূপ মূল্য দিয়া চলে না।"

**ব্যাখ্যা ঃ** দুনিয়ার জিন্দেগীতে অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন বস্তুর বিশেষ শক্তি বা বিরাটত্ব ইত্যাদির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া আল্লাহকে ছাড়িয়া সেই সব বস্তুর পূজায় লিপ্ত হয়। কেয়ামতের দিন—যে দিন দুনিয়ার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মানুষ এক ময়দানে একত্রিত থাকিবে সেই দিন আল্লাহ তায়ালা ঐ সব বস্তু-পূজারীদের অন্যায়টা প্রত্যক্ষভাবে দেখাইবার ও ধরাইয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থা করিবেন যে, ছোট, বড়, ও বৃহত্তম—যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু তাঁহার অধীনে ও সর্ব্বাধিপত্বে হওয়ার দৃশ্য সর্ব্ব সমক্ষে স্পষ্টরূপে প্রকটিত ও রূপায়িত করিবেন এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিবেন, আজ চাক্ষুসরূপে দেখিয়া নেও সর্ব্বাধিপতি, সর্ব্বশক্তির অধিকারী, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বমহান একমাত্র আমি। কিন্তু তোমরা আমাকে ছাড়িয়া আমার নিম্নস্থ, আমার অধীকারস্থ, আমার আধিপত্যের বস্তুকে পূজা করিয়াছিলে; তাহার শাস্তি আজ তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

---

* হাদীছটি বোখারী শরীফে তিন স্থানে উল্লেখ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ফৎহুলবারী ১৩—৩৩৮×৩৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্যাদি দৃষ্টে তরজমা করা হইল।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককেই তাহার অন্যায় অপরাধ ধরাইয়া দিয়া শাস্তি দান করিবেন।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—আল্লাহ তায়ালা নিরাকার নিরাধার ইহার প্রতি অটল অনড় বিশ্বাস ও আক্বিদা সর্ব্বদার জন্য অন্তরে নিবদ্ধ রাখিয়া বিভিন্ন হাদীছে উল্লেখিত হাত, পা, আঙ্গুল ইত্যাদি সম্পর্কে এই ধারণা রাখিবে যে, আমাদের স্থূল ও সাকারে সীমাবদ্ধ জ্ঞান ও অনুভূতির খাতিরে এই সব শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সবের উদ্দেশ্য আমাদের দৃষ্ট ও অনুভূত অঙ্গ সমূহ কখনও নহে। এই সব অঙ্গ ত সাকার ও স্থূল দেহের বৈশিষ্ট্য; আল্লাহ তায়ালা ত নিরাকার। সুতরাং সেই অনুপাতেই এই সব শব্দের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত আছে। অবশ্য উহা আমাদের জ্ঞানের ও অনুভূতির এবং ধারণার ও অনুমানের উর্দ্ধে, কিন্তু আমরা সেই উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি।

**১৯৩৯। হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এই বর্ণনা দিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা সমগ্র ভূমণ্ডলকে স্বীয় মুষ্ঠীতে লইবেন। আসমান সমূহকে স্বীয় ডান হাতে জড়াইবেন (—এইভাবে সমুদয় সৃষ্টের উপর স্বীয় সর্ব্বাধিপত্য রূপায়িত করিয়া) অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, আমার সর্ব্বাধিপত্য বাস্তবায়িত রূপে চাক্ষুস দেখিয়া নেও। দুনিয়াতে যাহারা ক্ষমতা ও আধিপত্যের দাবী করিত বা যাহাদিগকে ঐরূপ স্বীকার করা হইত তাহারা কোথায়?

**ব্যাখ্যা ঃ**—দুনিয়ার জিন্দেগীতে ক্ষমতা-মদে মত্ত এবং তাহাদের চেলাদিগকে কটাক্ষ করিয়া তাহাদের অন্যায় অপরাধ ধরাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা এই ব্যবস্থা করিবেন।

আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত তথ্যটি পবিত্র কোরআনেও উল্লেখ রহিয়াছে—

وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِينِهِ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ

"কেয়ামতের দিন সমগ্র ভূমণ্ডল আল্লাহ তায়ালার মুঠে হইবে এবং আসমান সমূহ তাঁহার হাতে জড়ান থাকিবে (ইহা দ্বারা বাস্তবে রূপায়িত করিয়া দেখাইবেন—তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই, কেহ হইতে পারে না,) তিনি অদ্বিতীয়, পাক-পবিত্র এবং কাফের মোশরেকরা যত কিছুকেই তাঁহার শরীক ঠাওরাইতেছে তিনি সে সব হইতে অতি মহান, অতি উর্দ্ধে।" (ছুরা যুমার—২৪ পারা ৪ রুকু)

১৯৪০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ইস্রাফিল ফেরেশতার দ্বিতীয় শিঙ্গা-ফুঁকের পর সর্ব্ব প্রথম আমি সচেতন হইয়া মাথা উঠাইব এবং দেখিতে পাইব, মূছা (আঃ) সচেতন অবস্থায় আরশের পায়া ধরিয়া আছেন। ইহা আমি বলিতে পারি না, তিনি সচেতন অবস্থায় বহাল ছিলেন বা অচেতন হওয়ার পর (আমার পূর্ব্বেই) সচেতন হইয়াছেন।

**ব্যাখ্যা ঃ**—ইস্রাফিল (আঃ) ফেরেশতার দুইবার শিঙ্গা-ফুঁকের উল্লেখ পবিত্র কোরআনেও রহিয়াছে—

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

"শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে, ফলে আসমান-জমিনের সকলেই অচেতন হইয়া পড়িবে (—জীবিতগণ মরিয়া যাইবে এবং মৃতগণের রূহ্ চৈতন্যহীন থাকিবে ;) অবশ্য যাঁহাদের হুশ থাকা আল্লাহই ইচ্ছা করিবেন (তাঁহাদের হুশ বহাল থাকিবে।) তৎপর দ্বিতীয়বার সেই শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হইবে। তৎক্ষণাৎ সকলেই (জীবিত হইয়া) চৈতন্য অবস্থায় দাঁড়াইয়া যাইবে।" (২৪ পারা ৪ রুকু)

ঐ সময় যাঁহাদের হুশ থাকিবে তাঁহারা হইলেন মহান আরশের বাহক ফেরেশতাগণ। এতদ্ভিন্ন মূছা (আঃ)ও ঐ শ্রেণীভুক্ত হইবেন কিনা—তাহাই আলোচ্য হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে।

১৯৪১। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, শিঙ্গায় উভয় ফুৎকারের মধ্যে চল্লিশের ব্যবধান হইবে। লোকগণ-জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু হোরায়রা! চল্লিশ বৎসর? তিনি বলিলেন, তাহা আমি শুনি নাই ; তাহারা বলিল, চল্লিশ মাস? তিনি বলিলেন, তাহা আমি জানি না। তাহারা বলিল, চল্লিশ দিন? তিনি বলিলেন, আমি তাহাও বলিতে পারি না।

তিনি আরও বলিলেন, মানব-দেহের সর্ব্বাংশই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু তাহার মেরুদণ্ডের সর্ব্ব নিম্ন অস্থি খণ্ডটা অক্ষয় থাকিবে এবং উহা হইতেই তাহার দেহের পুনঃ নির্মান হইবে।

**ব্যাখ্যা ঃ**—এই হাদীছে প্রকৃত প্রস্তাবেই চল্লিশের উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত ছিল না। তাই আবু হোরায়রা (রাঃ) এই হাদীছ বর্ণনা প্রসঙ্গে উহা নির্দ্ধারিত করিতে

অস্বীকার করিয়াছেন। অবশ্য অন্য এক হাদীছ মারফৎ উহা নির্দ্ধারিত হয় যে, চল্লিশের উদ্দেশ্য চল্লিশ বৎসর। (ফৎহুল বারী—৮ × ৪৪৮)

**১৯৪২। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা কাবা শরীফের নিকটবর্ত্তী "ছক্বিফ" ও "কোরায়েশ" উভয় গোত্রের তিনজন লোক একত্রিত হইল। তাহারা মেদবহুল ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের জ্ঞান ছিল অতি কম। তাহাদের একজন প্রশ্ন উত্থাপন করিল, আমাদের কথাবার্ত্তা কি আল্লাহ তায়ালা শুনিয়া থাকেন? অপর একজন উত্তর করিল, সশব্দে কথা বলিলে তাহা শুনিয়া থাকেন, আর বিনা শব্দে বলিলে তাহা শুনেন না। তৃতীয় জন মন্তব্য করিল, যদি সশব্দে বলিলে শুনেন তবে নিঃশব্দে বলিলেও শুনিবেন। (অর্থাৎ কোন প্রকার কথাই শুনেন না।) তাহাদের এই শ্রেণীর আলোচনার প্রতি কটাক্ষ করিয়াই এই আয়াত নাযেল হইয়াছিল—

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ - وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

"দুনিয়াতে পাপ করা কালে নিজ নিজ কান, চক্ষু, চর্ম্ম ইত্যাদি অঙ্গ সমূহের সাক্ষী থাকা হইতে লুকাইবার ও বাঁচিবার শক্তি তোমাদের ছিল না। (কারণ কোন কাজ উহাদের অসাক্ষাতে করার উপায় নাই। আর আল্লাহ ত সর্ব্ব শক্তিমান তিনি উহাদেরকে বাকশক্তি দান করিবেন। ফলে তোমাদের কার্য্যাবলীর সাক্ষী সংগ্রহ কোন কঠিন ব্যাপার নহে। এতদৃষ্টে পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকাই তোমাদের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল,) কিন্তু মনে হয় তোমাদের ধারণা এই ছিল যে, তোমাদের কার্য্যবলীর খোজ-খবর আল্লাহ তায়ালার নাই। (সুতরাং তিনি কোন কিছুকে সাক্ষী বানাইবেন কিরূপে?) এই ধারণাই তোমাদিগকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে (যে, তোমরা বেপরওয়া ভাবে পাপ করিয়াছ। মানুষকে লজ্জা বা ভয় করিয়া পাপ করিবার সময় তাহাদের হইতে লুকাইয়াছ; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হইতে লুকাইতে পার না, তাঁহার সাক্ষীদের হইতে লুকাইতে পারিতেছ না; তাহা লক্ষ্য করতঃ আল্লাহকে লজ্জা ও ভয় করিয়া পাপ হইতে বিরত থাক নাই।) ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছ।" (২৪ পারা ১৭ রুকু)

**ব্যাখ্যা ঃ**—এই আয়াতের পূর্ব্ববর্ত্তী আয়াতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দানের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে—

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللّٰهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ - حَتّٰى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ -

"বিভীষিকাপূর্ণ অবস্থার দিক দিয়া একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন আল্লার দুশমনগণকে দোযখের পথে (হিসাব নিকাশের মাঠ—হাশর-ময়দানের দিকে) হাঁকাইয়া আনা হইবে, সকলকে একত্রিত ও সমবেতভাবে চালিত করা হইবে। যখন তাহারা তথায় পৌঁছিবে তখন তাহাদের কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম্ম তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের কার্য্যাবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে। তাহারা নিজেদের চর্ম্মকে সম্বোধন করিয়া বলিবে, তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে কেন? তাহারা বলিবে, আজ আল্লাহ আমাদিগকে বাকশক্তি দিয়াছেন। যিনি অন্যান্য বহু জিনিষকে বাকশক্তি দিয়া ছিলেন এবং তিনি তোমাদিগকে প্রথমেও সৃষ্টি করিয়া ছিলেন এবং পুনরায় তাঁহার প্রতি তোমাদিগকে আসিতে হইয়াছে।" (২৪ পারা ১৭ রুকু)

উল্লেখিত বিষয়টি ছুরা ইয়াছীনের মধ্যে এইরূপে বর্ণিত আছে—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ -

"কেয়ামতের দিন আমি তাহাদের মুখের বাকশক্তি কিছু সময়ের জন্য রহিত করিয়া দিব এবং তাহাদের হাত আমার সম্মুখে কথা বলিবে, তাহাদের পা তাহাদের কার্য্যবলী সম্পর্কে সাক্ষ্য দান করিবে।" ১৮ পাঃ—ছুরা নূর ৩ রুকুতে বর্ণিত আছে—

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ -

"যে দিন তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাহাদের মুখ, তাহাদের হাত, তাহাদের পা—তাহাদের কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে। ঐ দিন আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত কর্ম্মফল পূর্ণরূপে ভোগ করাইবেন এবং ঐ দিন সকলেই উপলব্ধি করিবে, নিশ্চয় আল্লাহ সঠিক বিচারক এবং প্রতিটি বিষয়ের বাস্তবরূপ প্রকাশকারী।"

উল্লেখিত তিনটি আয়াতের সমষ্টি দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, বদকার মানুষের বিরুদ্ধে তাহার হাত, পা, চোখ, কান, চামড়া সাক্ষ্য দিবে। এতদ্ভিন্ন এক হাদীছে বর্ণিত আছে—সর্ব্ব প্রথম সাক্ষ্য হইবে বাম পার্শ্বের উরুর।

অঙ্গ-প্রতঙ্গের সাক্ষ্যদান সম্পর্কে মোছলেম শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা (লোকদের হিসাব-নিকাশের ও ছওয়াল-জওয়াবের সময়) এক ব্যক্তিকে ডাকিবেন এবং তাঁহার প্রদত্ত নেয়ামত সমূহ স্মরণ ও স্বীকার করাইয়া প্রশ্ন করিবেন, তোর কি এরূপ আকিদা ও বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হইয়া হিসাবের জন্য আমার সম্মুখে আসিতে হইবে? তখন সে বলিবে, না—আমার এরূপ আকিদা ছিল না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, قد انساك كما نسيتنى "যেমন তুই আমাকে ভুলিয়া রহিয়াছিলি, আমিও তোকে ভুলিয়া থাকিব (তোকে রহমত দান করিব না।) তারপর অন্য একজনকে ডাকিয়া আল্লাহ পাক ঐরূপ প্রশ্নই করিবেন; সেও ঐরূপ উত্তর দিবে। আল্লাহ পাক তাহাকেও ঐরূপ বলিবেন। তারপর তৃতীয় আর একজনকে ডাকিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলে সে দাবী করিয়া বসিবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার উপর, তোমার কিতাবের উপর, তোমার রসুলের উপর ঈমান আনিয়াছিলাম, ছদকা-খয়রাত করিয়াছিলাম—এরূপ ভাবে সে যতদূর পারে নেক আমলের দাবী করিবে। (অর্থাৎ তোমার নিকট হিসাবের জন্য হাজির হইতে হইবে এই বিশ্বাস আমার ছিল, তাই আমি এই সব করিয়াছি।) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে মোনাফেক, তাহার সব দাবী মিথ্যা। তখন আল্লাহ তায়ালা তাহাকে বলিবেন, আচ্ছা। তুমি দাঁড়াও, তোমার মিথ্যা দাবী-দাওয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়াইতেছি। সে ভাবিতে থাকিবে যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষ্য দিবে? এমন সময় তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হুকুম করা হইবে, তোমরা সাক্ষ্য দাও। (আল্লাহ তায়ালা সব কিছু জানেন তাহা সত্বেও এরূপ করা হইবে) যেন তাহার জন্য ওজর-আপত্তির কোন পথ না থাকে (সম্পূর্ণরূপে দুষী সাব্যস্ত হইয়া মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়)।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে মোছলেম শরীফের অন্য আর এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কেয়ামতের দিন পাপী ব্যক্তিগণ এরূপ দাবীও করিবে যে, হে আল্লাহ! তুমিই বলিয়াছ—আমাদের উপর জুলুম করিবা না; কাজেই আমার বিরুদ্ধে অপরের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হইতে দিব না। সে মনে করিবে এইরূপ হইলে আমি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবই না এবং আমার গোনাহ্ খাতার সাক্ষীও পাওয়া যাইবে না।) তখন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন—

كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا

অর্থাৎ কেরামুন-কাতেবীন ফেরেশতাদ্বয়ের সাক্ষ্য ত আছেই ইহা ছাড়া আজ তোর সাক্ষ্যই যথেষ্ট হইবে। এই বলিয়া তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সাক্ষ্য দিবার জন্য হুকুম করা হইবে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার ভাবে প্রত্যেকটি কাজের সাক্ষ্য দিবে। তারপর যখন পুনরায় তাহার বাকশক্তি খুলিয়া দেওয়া হইবে তখন সে ক্রোধান্বিত হইয়া নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, তোরা ছাই-ভস্ম হইয়া যা; তোদের মত নিমক-হারামদের জন্য আমি দুনিয়াতে কত ঝগড়া-বিবাদ করিয়া তোদেরকে রক্ষা করিয়াছিলাম, পরিপুষ্ট করিয়াছিলাম।

সাক্ষ্য গ্রহণের সময় তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে; কারণ সাক্ষ্য দেওয়ার সময় যেন মিথ্যা প্রতিবাদ ও ঝগড়া-বিবাদ করার সুযোগ না থাকে। যেমন দুনিয়াতে সাধারণতঃ হইয়া থাকে এবং আখেরাতেও কাফেরগণ প্রথমে ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিবে। যেমন এক হাদীছে বর্ণিত আছে, এক শ্রেণীর কাফের বা মোনাফেককে যখন ডাকিয়া হিসাব লওয়া হইবে তখন সে দাবী করিয়া বসিবে, আমি যে সকল গোনার কাজ করি নাই তাহাও ফেরেশতা আমার নামে লিখিয়া রাখিয়াছেন। তখন ঐ ফেরেশতা বলিবে, ওহে! তুমি অমুক দিন অমুক জায়গায় এই গোনাহ করিয়াছিলে না? সে বলিবে, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কস্মিনকালেও এই গোনাহ আমি করি নাই। তখন তাহার বাকশক্তি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিবে। (রুহুল মায়ানী)

**১৯৪৩। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মক্কাবাসীগণকে দ্বীন-ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলে তাহারা তাঁহার কথা অস্বীকার ও অমান্য করিয়াছিল। তখন হযরত (দঃ) তাহাদিগকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য এই বদ-দোয়া করিয়াছিলেন—اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوْسُفَ "আয় আল্লাহ! আমাকে তাহাদের মোকাবেলায় সাহায্য কর তাহাদিগকে সাত বৎসরের দুর্ভিক্ষে নিপতিত করিয়া—যেরূপ দুর্ভিক্ষ ইউসুফ নবীর যুগে হইয়াছিল।" ফলে তাহাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ আসিল যে, উহাতে সমুদয় চিজ-বস্তু নিঃশেষ হইয়া গেল। তাহারা প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অস্থি, চর্ম, মৃতদেহ ইত্যাদি খাইতে লাগিল। ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা চোখে ধুঁয়া দেখিতে লাগিল। পবিত্র কোরআনে ইহারই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল—

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِى السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ يَّغْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ -

"আপনি অপেক্ষা করুণ ঐ দিনের যে দিন উপরের দিকে তাহাদের নজরে ধূঁয়া দৃষ্ট হইবে, সেই ধূঁয়া (দেখার কারণ—ভীষণ দুর্ভিক্ষ) তাহাদের সকলকে ঘিরিয়া ধরিবে যাহা তাহাদের উপর এক কঠিন আজাব হইবে।" (২৫ পারা ১৪ রুকু)

দুর্ভিক্ষে পতিত মক্কাবাসীদের তৎকালীন সর্দ্দার আবু সুফিয়ান হযরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনার বংশধর মক্কাবাসী মোজার গোত্রীয় লোকগণ ধ্বংসের সম্মুখীন। অতএব আপনি আল্লার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করুন—আল্লাহ যেন বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া দুর্ভিক্ষের আজাব দূরীভূত করিয়া দেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, তুমি আমাকে মোজার বংশীয় লোকদের জন্য দোয়া করিতে বল (যাহারা আল্লার দুশমন)? তুমি ত বড়ই দুঃসাহসী! শেষ পর্য্যন্ত হযরত (দঃ) তাহাদের জন্য দোয়া করিলেন। ফলে তাহাদের অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হইল। এই সম্পর্কেও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—

إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ -

"আমি আজাবকে তোমাদের হইতে কিছু দিনের জন্য দূরীভূত করিয়া দিব, কিন্তু (আজাব দূরীভূত হওয়ার পর) নিশ্চয় তোমরা (তোমাদের দুষ্কৃতির প্রতি) পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।"

অবস্থা তাহাই হইল। তাহারা যখন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ পাইল পুনরায় খোদাদ্রোহিতার ময়দানে উন্মাদ হইয়া ছুটিল।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পুনঃ পাকড়াও করিলেন—প্রতিশোধ গ্রহণের পাকড়ানো, তাই উহা হইতে আর তাহারা রক্ষা পাইল না। পূর্ব্বোল্লিখিত আয়াতের সঙ্গে এই বিষয়টিও উল্লেখ রহিয়াছে—

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

"যে দিন আমি তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে পাকড়াও করিব, সে দিন অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করিব।" এই পাকড়াও হইয়াছিল বদরের জেহাদের দিন। (সেই দিন তাহাদের বড় বড় সর্দ্দারগণ নিহত হইয়া চির জাহান্নামী হইয়াছিল।)

**১৯৪৪। হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে আমি কখনও পূর্ণমুখ খুলিয়া হাসিতে দেখিনাই। তাঁহার অভ্যাস ছিল মুচকি হাসি দেওয়া। তাঁহার আরও একটি অভ্যাস ছিল যে, ঘনঘটা ও মেঘপুঞ্জ বা ঝড় দেখিলে তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর মলিনতা আসিয়া যাইত।

একদা আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! মেঘ দেখিলে মানুষ বৃষ্টির আশায় আনন্দিত হয়। আপনাকে দেখি—আপনি মেঘ দেখিলে চিন্তিত হইয়া পড়েন! নবী (দঃ) বলিলেন, মেঘপুঞ্জে আজাবের আশঙ্কা হইতে আমি নিশ্চিত থাকিতে পারি না। পূর্ব্ব যুগের এক জাতি আজাব বাহক মেঘপুঞ্জ দেখিয়া আনন্দে বলিয়াছিল, "এই ত মেঘমালা আসিতেছে আমাদিগকে বৃষ্টি বর্ষণ করিবে।"

**ব্যাখ্যা ঃ**—ঘটনাটি আদ জাতির; তাহারা দীর্ঘ দিন অনাবৃষ্টির দরুণ দুর্ভিক্ষে ভুগিতেছিল। একদিন তাহারা তাহাদের বস্তির দিকে কাল মেঘপুঞ্জ আসিতে দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং বলিতে লাগিল—"এই ত মেঘমালা আসিতেছে; আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করিবে"। বস্তুতঃ উহা দ্বারা প্রলয়ঙ্করী ঘুর্ণিবাত সৃষ্টি হইল এবং সাত রাত আটদিন পর্য্যন্ত ঝঞ্ঝা বহিয়া তাহাদেরে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিল। পবিত্র কোরআন ২৭ পাঃ ৮ রুকুতে এই ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ চতুর্থ খণ্ড দ্রষ্টব্য। নবী (দঃ) এই ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

এক হাদীছে আছে—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন নবী (দঃ) আকাশে মেঘপুঞ্জের সঞ্চার দেখিলেই কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া উহার প্রতি তাকাইতেন এবং এই দোয়া করিতেন---اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ আয় আল্লাহ! ইহার মধ্যে যাহা কিছু অনিষ্ট আছে উহা হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

অতঃপর পর সেই মেঘপুঞ্জ দূরীভূত হইয়া গেলে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিতেন। আর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হইলে এই দোয়া পড়িতেন—اَللّٰهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا "হে আল্লাহ উপকারী বৃষ্টি দান করুন।" (মেশকাত শরীফ ১৩৩)

এতদ্ভিন্ন তৃতীয় খণ্ডে ১৫৮৫ নং হাদীছ খানাও এই বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে উল্লেখ আছে—মেঘপুঞ্জ দেখিলে নবীজী (দঃ) বিচলিত হইয়া উঠিতেন। এবং বৃষ্টি বর্ষিত হইলে তাঁহার বিচলন দূর হইত।

**১৯৪৫। হাদীছ ঃ**—ইবনে আবী মোলায়কা (রঃ) (আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রাঃ) হইতে) বর্ণনা করিয়াছেন, মোসলমানদের মধ্যে সর্ব্বোত্তম ব্যক্তিদ্বয়—আবু বকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ) ভয়ঙ্কর ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের কণ্ঠ-স্বর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে উচ্চ হইয়া যাওয়ার কারণে।

ঘটনা এই ছিল—একদা বনী-তামীম গোত্রের এক দল লোক হযরতের খেদমতে পৌঁছিল। তাহাদের অভিপ্রায়ে হযরত (দঃ) সেই গোত্রের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিলেন। আবুবকর (রাঃ) ক্বা'-ক্বা'-ইবনে মা'বাদ (রাঃ) নামক

ছাহাবীর নাম প্রস্তাব করিলেন। ওমর (রাঃ) বলিলেন, না—বরং আক্‌রা-ইবনে হাবেস (রাঃ) নামক ছাহাবীকে প্রেরণ করা হউক। এতচ্ছ্রবণে আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)কে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, আপনার ইচ্ছাই হইল আমার বিরোধিতা করা। ওমর (রাঃ) বলিলেন, আপনার বিরোধিতার প্রতি আমার মোটেও লক্ষ্য নাই। এইভাবে তাঁহাদের মধ্যে বিতর্ক বাঁধিল এবং (হযরতের সম্মুখেই) তাঁহাদের উভয়ের কণ্ঠ-স্বর উচ্চ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এই আয়াত নাযেল হইল ঃ—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ - إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى - لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ -

"হে মোমেনগণ! নবীর (সম্মুখে পরস্পর কথা-বার্ত্তার মধ্যেও তাঁহার) আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ আওয়াজে কথা বলিতে পারিবে না। এবং নবীর সঙ্গে কথা বলিতে পরস্পর কথা বলার ন্যায় সম স্বরেও কথা বলিতে পারিবে না। (নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে এই সব আদব-তমীযের নিয়মাধীন না চলিলে) আশঙ্কা আছে—তোমাদের অলক্ষ্যে তোমাদের সারা জীবনের নেক আমল নষ্ট ও বরবাদ হইয়া যাইতে পারে। নিশ্চয় যাহারা আল্লার রসুলের সম্মুখে (এমন আদব-তমীযের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলে, এমনকি তাহাদের কণ্ঠ-স্বর অত্যন্ত মোলায়েম ও সংযত রাখে, আল্লার রহমতে তাহাদের অন্তর খাঁটী তাক্বওয়া-পরহেজগারীতে পরিপূর্ণ। তাঁহাদের জন্য মাগফেরাত ও অতি বড় প্রতিদান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। (ছুরা হুজরাত—২৬ পারা ১৩ রুকু).

এই ঘটনার ও এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর বিশেষভাবে ওমর (রাঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে কথা বলিতে এত দূর সংযত ও ছোট আওয়াজে কথা বলিতেন যে, অনেক সময় পুনঃ না বলিলে তাঁহার কথা ধরা যাইত না।

১৯৪৬। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মজলিসে ছাবেত ইবনে ক্বায়স (রাঃ) নামক ছাহাবীকে খোঁজ করিয়া পাইলেন না। এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি আপনার জন্য তাহার সংবাদ নিয়া আসিব।

সেমতে ঐ ব্যক্তি ছাবেত ইবনে ক্বায়সের নিকট আসিল এবং দেখিতে পাইল, তিনি ভীষণ অনুতপ্ত ও আতঙ্কগ্রস্তরূপে অবনত মস্তকে ঘরে বসিয়া আছেন ; ঘর হইতে বাহিরই হন না। ঐ ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কি হইয়াছে ? তিনি বলিলেন, এই নরাধমের অবস্থা খুবই খারাপ। এই নরাধমের আওয়াজ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আওয়াজ হইতে উচ্চ হইয়া থাকিত। ( সৃষ্টিগতভাবে স্বাভাবিক রূপেই ঐ ছাহাবীর স্বর উচ্চ ছিল। ) অতএব ( পবিত্র কোরআনের আয়াত অনুসারে ) এই নরাধমের সমুদয় আমল নষ্ট ও বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

এতচ্ছ্রবণে ঐ ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সেই ছাহাবীর সমুদয় উক্তি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। ( হযরত (দঃ) তাহাকে পুনঃ ঐ ছাহাবীর নিকট পাঠাইলেন )। সেই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার তাঁহার নিকট এক মহান সুসংবাদ বহন করিয়া আসেন—হযরত (দঃ) তাহাকে বলিলেন ঃ—

اِذْهَبْ اِلَيْهِ فَقُلْ لَهٗ اِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَلٰكِنَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

"তুমি তাহার নিকট যাও এবং তাহাকে সুসংবাদ দাও—নিশ্চয় আপনি দোযখী হইবেন না, বরং আপনি হইবেন বেহেশতী।"*

---

* তথা কথিত মাওলানা আকরম খাঁর "মোস্তফা চরিত" দেখার দুর্ভাগ্য হইতে আল্লাহ তায়ালা বাঁচাইয়া ছিলেন এবং ঐ পবিত্র নামের অপবিত্র বই খানা পঁচা গুদামে পরিত্যক্ত হইয়া ছিল। ইদানিং দৈনিক পত্রিকা আজাদ মারফৎ উহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

উহার ভূমিকায়ই ইসলামের মূলে কুঠারাঘাতকারী জঘন্যতম মিথ্যা ও ভুল উক্তি রহিয়াছে। তাহারই বাক্যে সেই কুখ্যাত উক্তিটা শুনুন—"সর্ব্বাপেক্ষা প্রমান্য ছহি-বোখারী ও ছহি-মোছলেম হইতে কতকগুলি নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই হাদীছ গুলির ছনদ ছহীহ হওয়া সম্বন্ধে কোন তর্কই নাই—কারণ এগুলি বোখারী ও মোসলেমের হাদীছ। ঐ হাদীছ গুলি প্রকৃত ও সত্য হাদীছ বলিয়া কোন মতেই গৃহিত হইতে পারে না।"

কি জঘন্য উক্তি ! যে, বোখারী-মোছলেম শরীফেও এমন হাদীছ আছে যাহা সত্য বলিয়া গৃহিত হইতেই পারে না, অর্থাৎ ঐ হাদীছের মিথ্যা হওয়া অবধারিত।

পাঠকবর্গ ! লক্ষ্য করুন কি পাগলামী ! আকরম খাঁ সাহেব জীবিত থাকা কালে বক্ষমান গ্রন্থেই তাহার এই শ্রেণীর অনেক উক্তির সমালোচনাই আমরা করিয়াছি, এখন তিনি তাহার কর্ম্মফল ভোগের জায়গায় পৌঁছিয়াছেন আমাদের সমালোচনার প্রয়োজন আর নাই। তবুও পাঠকদের ঈমান রক্ষার্থে তাহার পাগলামীটা ধরাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

বোখারী শরীফে মিথ্যা হাদীছ আছে বলিয়া আকরম খাঁ যে সব নমুনা পেশ করিয়াছেন উহার প্রথমটিই হইল আলোচ্য হাদীছটি। এই হাদীছটি সম্পর্কে তাহার কি নির্লজ্জ উক্তি যে—"এই হাদীছটি কখনই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহিত হইতে পারে না। তাঁহার দাবী মিথ্যা প্রমাণ করার বিস্তারিত বিবরণ পঞ্চম খণ্ডের অবতরণিকায় বর্ণিত রহিয়াছে।

১৯৪৭। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (কেয়ামতের হিসাব-নিকাশান্তে অসংখ্য ও অগণিত) দোযখীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হইবে, কিন্তু (তবুও দোযখ পরিপূর্ণ হইবে না এবং তাহার স্পৃহা কমিবে না।) সে বলিতে থাকিবে, আরও অধিক আছে কি? এমনকি অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর স্বীয় কুদরতের এমন প্রভাব প্রয়োগ করিবেন যাহাতে দোযখের গভীরতা এবং প্রশস্ততা সংকোচিত হইয়া যাইবে। তখন সে বলিবে, যথেষ্ট হইয়াছে—যথেষ্ট হইয়াছে।

**ব্যাখ্যা ঃ**—পবিত্র কোরআনে জাহান্নামের গভীরতা ও প্রশস্ততার বিবরণে আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ -

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমার পেট পুরিয়াছে কি? সে বলিবে, আরও অধিক আছি কি?" (ছুরা ক্বাফ—২৬ পারা)

উল্লেখিত হাদীছখানা উক্ত আয়াতের তাৎপর্য্যেই বর্ণিত হইয়াছে।

১৯৪৮। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশত ও দোযখের মধ্যে বিতর্ক হইল—দোযখ বলিল, বড় বড় মানুষ যাহারা ফখর ও গর্ব্বকারী তাহারা আমার ভাগে আসিবে। তখন বেহেশত আল্লাহ তায়ালার নিকট ফরিয়াদ করিল, হে পরওয়ারদেগার! আমার ভাগে শুধু দুর্ব্বল ও নিম্নস্তরের বিবেচিত লোকগণ কেন হইবে? তদুত্তরে আল্লাহ তায়ালা বেহেশতকে বলিয়াছেন, তুমি আমার রহমতের স্থান। তোমার দ্বারা আমি আমার বান্দাদেরকে রহমত দান করিব যাহাকে ইচ্ছা করিব। (আমার রহমতের ক্ষেত্রে কাহারও আত্মম্ভরিতা ও গর্ব্ব-ফখর কাজে আসিবে না, নম্রতার দ্বারাই উহা লাভ হইতে পারিবে।) আর দোযখকে বলিয়াছেন, তুমি আমার আজাব ও শাস্তিদানের স্থান; তোমার দ্বারা আমি শাস্তি দান করিব যাহাকে ইচ্ছা করিব, (কাহারও প্রভাব প্রতিপত্তি উহা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।)

আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উভয়কে ইহাও বলিয়াছেন, তোমাদের প্রত্যেককেই এই পরিমাণ অধিবাসী প্রদান করা হইবে যে, তোমরা পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে। অবশ্য দোযখ পরিপূর্ণ না হওয়ার দরুণ আল্লাহ তায়ালা উহার উপর স্বীয় বিশেষ কুদরত প্রয়োগ করিবেন। যদ্দরুণ সে বলিতে বাধ্য হইবে যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে, যথেষ্ট হইয়াছে—বস্তুতঃ তখন দোযখের গভীরতা ও প্রশস্ততা কমিয়া গিয়া সে ভরিয়া যাইবে। (দোযখ পূর্ণ করিবার জন্য কোন নূতন সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হইবে না, কারণ) আল্লাহ তায়ালা কোন জীবকে বিনা অপরাধে দোযখে

ফেলিবেন না। পক্ষান্তরে বেহেশতকে পরিপূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নূতন মখলুক পয়দা করিবেন। (তাঁহারা বেহেশতবাসী মানুষের অধীনস্থ হইবেন।)

১৯৪৯। **হাদীছ ঃ**—আল্লাহ তায়ালা যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ - وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ -

"আপনি বিরোধীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, লাঞ্ছনা-ভৎর্সনার উপর ধৈর্য্যধারণ করিয়া চলুন এবং (তাহাদের ব্যথাদায়ক কথাবার্ত্তা ভুলিয়া থাকার সহায়করূপে আল্লার সঙ্গে সম্পর্কে দৃঢ় করার জন্য) সকাল-বিকাল স্বীয় প্রভুর গুণগানে (—নামায ও জিক্‌র-আজ্‌কারে) মশগুল হউন, বিশেষরূপে রাত্রেরও কিছু অংশে এবং প্রত্যেক নামাযের পরে প্রভুর তছবীহ—পবিত্রতার জিক্‌র করুন।" (ছুরা ক্বাফ—২৬ পাঃ)

উক্ত আয়াতের শেষ বাক্যটি লক্ষ্য করিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে প্রত্যেক নামাযের পরে তছবীহ পড়ার আদেশ করিয়াছেন।

১৯৫০। **হাদীছ ঃ**—মসরুক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আম্মাজান! হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কি তাঁহার প্রভু পরওয়ার-দেগারকে দেখিয়াছিলেন? আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, তোমার কথায় আমার শরীর শিহরিয়া উঠিয়াছে। তুমি তিনটি বিষয় জ্ঞাত নও কি? যে তিনটি বিষয় ঘটিয়াছে বলিয়া উক্তি করিলে তাহা মিথ্যা ও অবাস্তব হইবে। (১) যে বলিবে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রভু পরওয়ারদেগারকে দেখিয়াছেন তাহার কথা অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ—

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

"কোন মানুষের দৃষ্টি আল্লাহ তায়ালাকে আয়ত্ত্ব করিতে পারে না, কিন্তু (সব কিছু, এমনকি) সকলের দৃষ্টিও তাঁহার আয়ত্ত্বে।" আরও একটি আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ—

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ -

"কোন মানুষের জন্য (ইহজগতে) এই সুযোগ নাই যে, আল্লাহ তাহার সঙ্গে কালাম করেন তিন পন্থার কোন পন্থা ব্যতিরেকে—[ক] কাশফ ও এলহামরূপে

বাণী পৌঁছাইয়া। [খ] (মানবের দৃষ্টির) অন্তরাল হইতে। [গ] ফেরেশতা প্রেরণ করিয়া—যে ফেরেশতা বাণী পৌঁছাইয়া থাকেন।" * (ছুরা শূরা—২৫ পাঃ)

(২) আর যে ব্যক্তি বলিবে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আগামী দিনের অগ্রিম খবর জানিতেন তাহার উক্তিও অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) তাঁহার এই দাবীর সমর্থনেও আয়াত তেলাওয়াত করিলেন— وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا "কোন মানুষ জানে না, সে আগামী কাল কি করিবে।

(৩) আর যে ব্যক্তি বলিবে যে, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) (উম্মৎগণকে পৌঁছাইবার মত) কোন বস্তু গোপন রাখিয়া ছিলেন, তাহার উক্তিও মিথ্যা এবং অবাস্তব। আয়েশা (রাঃ) এই দাবীর সমর্থনেও এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন ঃ—

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ - وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ

"হে রসুল (দঃ)! আপনার নিকট যত কিছু নাযেল ও অবতীর্ণ করা হইয়াছে সবটুকুই আপনি লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিন; অন্যথায় আপনি আপনার রসুল হওয়ার পদের দায়িত্ব পালনকারী গণ্য হইবেন না।"

অতঃপর আয়েশা (রাঃ) হযরত (দঃ) কর্তৃক আল্লাহ তায়ালাকে দেখিবার প্রমাণ রূপে কথিত পবিত্র কোরআন ছুরা নজমের আয়াত— مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى "হযরত (দঃ) যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা দেখিবার সময় তাঁহার জ্ঞানশক্তি একটুও বিভ্রান্ত হইয়াছিল না।" এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى "হয়রত (দঃ) তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দেখিয়াছিলেন ছিদরাতুল-মোন্‌তাহার নিকট।" এই ধরণের আয়াত সমূহের বিষয় বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলেন, উক্ত আয়াত সমূহে যাঁহাকে দেখিবার কথা উল্লেখ হইয়াছে তিনি ছিলেন ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ)। ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিলেও হযরত (দঃ) তাঁহাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে শুধুমাত্র দুইবার দেখিয়াছিলেন। উহারই বর্ণনা ছুরা নজমের মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

**ব্যাখ্যা ঃ**—মে'রাজ উপলক্ষে হযরত (দঃ) আল্লাহ তায়ালার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন কি—না সে সম্পর্কে ছাহাবীগণের মধ্যেই মতভেদ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবীর মতে দর্শন লাভ করিয়াছিলেন; যেহেতু তাহা এই জগতের সীমার বাহিরের ঘটনা, তাই উহা সম্ভব হইয়াছিল।

---

* আয়েশা রাজিয়াল্লাহু আনহার উদ্দেশ্য এই যে, সামনা-সামনি দেখারূপে কথা বলা ও শুনা যেরূপ অসাধ্য যাহা উক্ত আয়াতের মর্ম্ম তদ্রূপ দেখা-সাক্ষাৎও অসাধ্য।

আয়েশা (রাঃ) এবং আরও কতিপয় ছাহাবীর মতে দর্শন লাভ করেন নাই। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতও ইহাই ছিল। সেই জন্যই তিনিও ছুরা নজমের আয়াত সমূহ জিব্রাইল ফেরেশতাকে দেখা প্রসঙ্গে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

**১৯৫১। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছুরা নজমের আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, হযরত মোহাম্মদ (দঃ) জিব্রাইল ফেরেশতাকে তাঁহার আসল আকৃতিতে দেখিয়াছিলেন—তখন জিব্রাইল ফেরেশতা ছয় শত ডানা বিশিষ্ট ছিলেন।

**১৯৫২। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছুরা নজমের এক আয়াতের ব্যাখ্যায় ইহাও বলিয়াছেন, হযরত নবী (দঃ) সম্মুখ দিকে আকাশের ঊর্দ্ধ কিনারায় সবুজ বর্ণের মখমল দেখিতে পাইয়া ছিলেন, যাহা এত বড় আকারের ছিল যে, আকাশের কিনারা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

**ব্যাখ্যা ঃ**—ঐ মখমল হয়ত গালিচা-বিশিষ্ট ছিল যাহার উপর জিব্রাইল (আঃ) কুরছি বা আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিম্বা জিব্রাইল আলাইহেচ্ছালামের গায়ের পোষাক ছিল ঐ মখমল বা তাঁহার ডানাগুলির সৌন্দর্য্য সবুজ মখমলের ন্যায় ছিল।

**১৯৫৩। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ক্বায়স (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, (এক শ্রেণীর মোমেনের জন্য বেহেশতের মধ্যে ফল-ফুলাদির আরাম-আয়েশ পূর্ণ মনোরম) দুই দুইটি বাগান থাকিবে। যাহার বাংলো, কুঠি ও পাত্র (ইত্যাদি ফার্ণিচার সমূহ এবং) সমুদয় জিনিষ রৌপ্যের তৈরী হইবে। অপর (এক শ্রেণীর মোমেনের জন্য) দুই দুইটি বাগান থাকিবে যাহার পাত্র সমূহ এবং সমুদয় জিনিষ স্বর্ণের তৈরী হইবে। আর বেহেশতীগণ চিরস্থায়ী বেহেশতের মধ্যে তাঁহাদের প্রভু পরওয়ারদেগারের দীদার ও সাক্ষাৎ লাভ করিবেন—এমন পরিচ্ছন্ন পরিবেশে যে, প্রভু পরওয়ারদেগারের মহত্ত্বের প্রভাবময় আভা ব্যতীত মধ্যস্থলে কোন প্রকার আবরণ থাকিবে না।

**ব্যাখ্যা ঃ**—পবিত্র কোরআন ছুরা রহমানের মধ্যে উক্ত দুই শ্রেণীর বাগানের উল্লেখ রহিয়াছে……وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভু পরওয়ারদেগারের সম্মুখে হিসাবের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করিয়া চলে তাহার জন্য দুইটি বিশেষ বাগান প্রস্তুত রহিয়াছে। …… وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتَانِ "উক্ত বাগানদ্বয় অপেক্ষা নিম্নস্তরের আরও দুইটি বাগান আছে……।"

উক্ত ছুরায় উল্লেখিত দুই শ্রেণীর বাগানের তুলনা মূলক তফসীল ও ব্যবধানও ব্যক্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যবতীত আলোচ্য হাদীছে আর একটি তফসীল এবং ব্যবধান

বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম শ্রেণীর বাগানের সমুদয় চিজ-বস্তু স্বর্ণ নির্ম্মিত হইবে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগানের সমুদয় চিজ-বস্তু রৌপ্য নির্ম্মিত হইবে।

প্রথম শ্রেণীর বাগানগুলি হইবে বিশিষ্ট মোমেনদের জন্য—তাঁহারা প্রত্যেকে উহার দুইটি করিয়া বাগান লাভ করিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাগানগুলি হইবে সর্ব্ব সাধারণ মোমেনদের জন্য, তাঁহারা প্রত্যেকে উহার দুই দুইটি বাগান লাভ করিবেন।

**১৯৫৪। হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) একদা বলিলেন, আল্লার লা'নৎ ও অভিশাপ ঐ সব নারীদের উপর যাহারা শরীরে চিত্র বা নাম ইত্যাদি খোদাই করিয়া অঙ্কিত করার প্রতি সমাজকে প্রলুব্ধ করে বা নিজ শরীরে উহা গ্রহণ করে এবং যাহারা ললাট বা কপালের উর্দ্ধাংশ মাথার চুল উপড়াইয়া কপাল প্রশস্ত করে বা ভ্রুর লোম উপড়াইযা উহাকে সরু করে এবং যাহারা রেতি ইত্যাদির সাহায্যে দাঁত ঘর্ষণ ও ক্ষয় করিয়া দাঁতকে সরু করে এবং দাঁতের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর নারীগণ রূপ-সজ্জার প্রবণতায় অঙ্গ-প্রতঙ্গের স্বাভাবিক সৌষ্ঠব ও গঠনের প্রাকৃতিক ও সৃষ্টিগত আকৃতি পরিবর্ত্তন ও বিকৃত করিয়া ফেলে। (রূপ সজ্জার এই অবাঞ্ছিত চাক-চিক্যের সাহায্যে তাহারা নিশ্চয়ই বেগানাদের চোখে ফুটিয়া উঠিতে চায়, সুতরাং তাহারা লা'নৎ ও অভিশাপের পাত্র।)

আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু আনহুর এই উক্তি শুনিতে পাইয়া উম্মে-ইয়াকূব নাম্নী এক মহিলা তাঁহার নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, আমি শুনিয়াছি—আপনি এই ক্ষেত্রে লা'নৎ করিয়া থাকেন? তিনি বলিলেন, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহাকে লা'নৎ করিয়াছেন, আল্লার কেতাব কোরআনে যাহার প্রতি লা'নৎ করা হইয়াছে তাহার প্রতি আমি লা'নৎ করিব না কেন? এতচ্ছ্রবণে মহিলাটি বলিল, আমি কোরআন শরীফ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি, কোথাও আমি এই শ্রেণীর লা'নৎ ও অভিশাপ পাই নাই। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যদি লক্ষ্য করিয়া পড়িতে তবে নিশ্চয় (দেখিতে) পাইতে। তুমি কি এই আয়াত কোরআন শরীফে পড় নাই ঃ—

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"রসুল (দঃ) তোমাদিগকে যাহা আদেশ করেন তোমরা উহাকে মজবুতরূপে গ্রহণ ও অবলম্বন কর। আর যাহা হইতে নিষেধ করেন উহা হইতে বিরত থাক।"

মহিলা বলিলেন, এই আয়াত ত কোরআন শরীফে তেলাওয়াত করিয়াছি। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াতে রসুলের নিষেধাজ্ঞা হইতে বিরত থাকার আদেশ করা হইয়াছে। আর উল্লেখিত কার্য্যাবলীকে রসুল (দঃ) নিষেধ করিয়াছেন।

অতঃপর মহিলা বলিলেন, আপনার স্ত্রীও ত ঐ কাজ করিয়া থাকে! আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, এখনই তুমি আমার গৃহে যাও এবং ভালরূপে খুঁজিয়া দেখ। মহিলা তাহাই করিলেন, কিন্তু তাঁহার দাবীর সত্যতা তিনি দেখিতে পাইলেন না। তখন আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিলেন, আমার স্ত্রী ঐরূপ কাজ করিলে কখনও আমার গৃহে তাহার ঠাই হইত না।

**ব্যাখ্যা ঃ**—বিশিষ্ট ছাহাবীগণের অন্যতম ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) এস্থলে একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যাহা বর্ত্তমান যুগের একটি মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধক। অধুনা অনেক কৃত্রিম মোসলেম নামধারীকে দেখা যায়, কোরআনের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ঠিকঠিক দেখাইয়া সুন্নাহ্‌কে অস্বীকার করিতে চায়। ঈমান ও ইস্‌লামের মূল কর্ত্তনকারী এই ব্যাধি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী ও কঠোর সতর্কবাণী স্বয়ং হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)ও অনেক করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারাই স্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, রসুলের আদেশ-নিষেধ তথা সুন্নার বরখেলাফকারী বস্তুতঃ কোরআনেরও বরখেলাফকারী।

এক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) একটি অতি মূল্যবান আদর্শও দেখাইয়াছেন। অনেক লোককে দেখা যায় তাহারা অপরকে পরহেজগারীর নছিহত করিয়া থাকে, কিন্তু নিজের পরিবার-পরিজনকে পরহেজগার বানাইবার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করে না। আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি ঐরূপ কটাক্ষ করা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি কটাক্ষকারিনীকে তাঁহার গৃহে যাইয়া তল্লাসী লওয়ার অনুমতি দিলেন। অধিকন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন— لو كانت كذالك ما جامعتنا "আমার স্ত্রী ঐ শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকিলে, আমার নিকট তাহার ঠাই হইত না।"

**৯৫৫। হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং সে অতিশয় ক্ষুধার্ত বলিয়া প্রকাশ করিল। তখন হযরত (দঃ) প্রথমতঃ নিজ গৃহে স্বীয় স্ত্রীগণের নিকট ( তাহার জন্য খাদ্য চাহিয়া ) সংবাদ পাঠাইলেন। নবী-পত্নিগণ সকলেই উত্তর পাঠাইলেন, আমাদের নিকট একমাত্র পানি ভিন্ন কিছুই নাই। তখন হযরত (দঃ) আহ্বান জানাইলেন, কেহ আছে কি! এই ব্যক্তিকে অদ্য রাত্রে মেহমানরূপে গ্রহণ করিয়া লয়? মদীনাবাসী এক ছাহাবী দাঁড়াইয়া বলিলেন, হাঁ—আমি প্রস্তুত আছি ইয়া রসুলুল্লাহ! এই বলিয়া তিনি মেহমানকে সঙ্গে নিয়া বাড়ী ফিরিলেন এবং স্ত্রীকে বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের

মেহমান নিয়া আসিয়াছি। পুরাপুরীভাবে রসুলুল্লার মেহমানের খাতির-তাওয়াজু কর। মেহমানকে না দিয়া কোন বস্তু গৃহে জমা রাখিও না। স্ত্রী বলিল, গৃহে শুধুমাত্র ছেলে-মেয়েদের কিছু আহার রহিয়াছে। উহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তখন ঐ ছাহাবী স্ত্রীকে বলিলেন, ঐ খাদ্যটুকুই মেহমানের জন্য প্রস্তুত কর এবং ছেলে-মেয়েকে ঘুম পাড়াইয়া দাও। আর (আমাদের ছাড়া মেহমান খাদ্য গ্রহণ করিতে চাহিবে না, কিন্তু খাদ্য অল্প—আমরা খাইলে মেহমানের পেট ভরিবে না, তাই) খাওয়ার সময় বাতি নিভাইয়া দিও।

স্ত্রী তাহাই করিল—ছেলে-মেয়েদেরকে ঘুম পাড়াইয়া দিল এবং ঐ খাদ্য মেহমানের জন্য প্রস্তুত করিয়া বাতি জ্বালাইয়া দিল। অতঃপর গৃহস্বামী মেহমানকে লইয়া খাইতে বসিলেন, তখন স্ত্রী বাতির সলিতা ঠিক করার ভান করিয়া বাতি নিভাইয়া দিল এবং অন্ধকারের মধ্যে গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী হাত নাড়াচাড়া করিয়া মেহমানকে এইরূপ বুঝাইলেন যে, তাঁহারাও তাহার সঙ্গে খাইতেছেন। বস্তুতঃ তাহারা কিছুই খান নাই। সব খাদ্যটুকু মেহমানকে খাইবার সুযোগ দিয়াছেন। এই ভাবে গৃহস্বামী ও তাহার স্ত্রী উভয়ে অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। ভোর বেলা ঐ ছাহাবী হযরতের খেদমতে উপস্থিত হইলে হযরত (দঃ) বলিলেন, অমুক স্বামী ও অমুক স্ত্রীর প্রতি আল্লাহ তায়ালা অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহাদের প্রশংসায় কোরআনের এই আয়াত নাযেল করিয়াছেন :—

وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ - وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -

"তাহারা ক্ষুধার্ত হইয়াও নিজে না খাইয়া অপরকে খাওয়ায়; যে ব্যক্তি নিজের দেলকে বখিলী ও কৃপণতা হইতে পবিত্র রাখিতে পারিয়াছে সে সফলকাম হইবেই।" (ছুরা হাশর—২৮ পারা)

**১৯৫৬। হাদীছ ঃ**- যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন এক জেহাদ উপলক্ষে আমরা হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনার বাহিরে গেলাম। ঐ সময় লোকদের মধ্যে খাদ্যের খুব অভাব পড়িল; সেই সুযোগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেক সর্দারকে (দুরভিসন্ধি মূলক ভাবে) এই প্রচারণা চালাইতে শুনিলাম যে, সে মদীনাবাসী আনছারগণকে পরামর্শ দিয়া বলিতেছে, "তোমরা রসুলুল্লার সঙ্গী (—মোহাজের)-গণকে কোন প্রকার সাহায্য করিও না। তোমরা তাহাদের উপর কোন খাদ্যদ্রব্য খরচ করিও না যেন তাহারা অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।"

এতদ্ভিন্ন (ঐ সময় একজন মোহাজের এবং একজন আনছারী ছাহাবীর মধ্যে কিছুটা ঝগড়ার সৃষ্টি হইল * সেই সুযোগে মোনাফেক-প্রধান) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে (মোহাজের ও আনছারদের মধ্যে ঘৃণা বিদ্বেষ সৃষ্টির উস্কানী দান স্বরূপ) এই দম্ভোক্তিও করিতে শুনিলাম—"এইবার মদীনায় ফিরিয়া যাইয়া সবল সংখ্যাগুরু তথা দেশবাসীগণ দুর্ব্বল সংখ্যালঘু বিদেশীগণকে মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিবে।"

যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের এই সব দুরভিসন্ধি মূলক কথাগুলি আমি আমার চাচার নিকট বলিলাম, আমার চাচা ঐগুলি নবী ছাল্লল্লোহু আলাইহে অসাল্লামের গোচরীভূত করিলেন। সেমতে নবী (দঃ) আমাকে ডাকিলেন, আমি হযরত (দঃ)কে সমুদয় ঘটনা খুলিয়া বলিলাম।

হযরত (দঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাহার সাঙ্গো-পাঙ্গগণকে ডাকাইলেন। তাহারা হযরতের নিদট কসম করতঃ সম্পূর্ণ ঘটনা অস্বীকার করিল। (যেহেতু আমার সাক্ষী ছিল না। আর তাহারা কসম করিয়াছে, তাই আইনতঃ) আমি হযরতের নিকট মিথ্যাবাদী হইলাম এবং তাহারা সত্যবাদী গণ্য হইল। ইহাতে আমি এত অধিক চিন্তিত ও ব্যাথিত হইলাম যে, সারা জীবনে কখনও এইরূপ হই নাই। এমনকি, আমি বাহিরে চলা-ফেরা ছাড়িয়া দিয়া গৃহভ্যন্তরে বসিয়া গেলাম। আমার চাচা আমাকে মালামত করিয়া বলিলেন, এমন ঘটনায় কেন পতিত হইয়াছিলেন যদ্দরুণ তুমি হযরতের নিকট মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়াছ এবং তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন?

অল্প সময়ের মধ্যেই আল্লাহ তায়ালা মোনাফেকগণকে মিথ্যাবাদী ঘোষনা করিয়া এবং তাহাদের ঐ সব দুরভিসন্ধির এবং উস্কানীমূলক কথার স্পষ্ট বিবরণ দান করিয়া اذا جاءك المنفقون—পূর্ণ ছুরা "মোনাফেকুন" নাযেল করিলেন তৎক্ষণাৎ হযরত নবী (দঃ) আমাকে সংবাদ দিয়া আনিলেন এবং উক্ত ছুরা আমার সম্মুখে তেলাওয়াত করিয়া বলিলেন, হে যায়েদ! আল্লাহ তায়ালা তোমার সত্যবাদীতার সাক্ষ্য ও ঘোষনা দিয়াছেন।

**১৯৫৭। হাদীছ ঃ** - জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা এক জেহাদের ছফরে ছিলাম। তখন এই ঘটনা ঘটিল—এক মোহাজের কোন ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া একজন আনছারী তথা মদীনাবাসী মোছলমানকে তাহার নিতম্বের উপর আঘাত করিল, ফলে আনছারী ব্যক্তি "হে আনছার ভাইগণ!" বলিয়া তাহার সাহায্যের জন্য আহ্বান করিল। অপর দিকে মোহাজের ব্যক্তি "হে মোহাজেরগণ!" বলিয়া তাহার সাহায্যের প্রতি আহ্বান করিল এবং তাহা হযরত (দঃ)ও শুনিলেন।

* পরবর্ত্তী হাদীছে সেই ঝগড়ার বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে।

এইরূপে দলীয় ভিত্তিতে সাহায্যের প্রার্থী হইয়া মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রতি রসুলুল্লাহ (দঃ) অতিশয় ঘৃণা ভরে বলিলেন, জাহেলিয়ত বা অন্ধকার যুগের রীতি-নীতির ডাকা-ডাকি কেন? লোকগণ হযরতের নিকট ঘটনা ব্যক্ত করিল যে, এক মোহাজের এক আনছারীকে তাহার নিতম্বে আঘাত করিয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, এই ধরণের ডাকা-ডাকি পরিত্যাগ করা আবশ্যক, ইহা বড়ই ঘৃণার বস্তু।

উক্ত ঝগড়ার ঘটনাটি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকেরও গোচরীভূত হইল (এবং ইহার দ্বারা মোসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে) সে বলিল, তাহাদের তথা মোহাজেরগণের এতই সাহস হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা এই কাজ করিয়াছে? খোদার কসম—এইবার মদীনায় ফিরিয়া যাওয়ার পর সবল সংখ্যাগুরু (তথা মদীনাবাসীগণ) দুর্ব্বল সংখ্যালঘু (তথা বিদেশী মোহাজের)গণকে তাড়াইয়া দিবে।

জাবের (রাঃ) বলেন, হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মদীনায় আসার প্রথম দিকে মদীনাবাসী মোসলমানদের সংখ্যাই অনেক অধিক ছিল, অবশ্য পরে মোহাজেরগণেরও সংখ্যাধিক্য হইয়াছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের এই উক্তি জ্ঞাত হইয়া ওমর (রাঃ) দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি আমাকে বাধা দিবেন না। আমি এই মোনাফেকের শিরচ্ছেদ করিয়া দেই। হযরত নবী (দঃ) বলিলেন, সহ্য করিয়া থাক; কেহ যেন এই কথা বলার সুযোগ না পায় যে, মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার দলভুক্তকেও মারিয়া ফেলে। (আবদুল্লাহ ইবনে উবাই "মোনাফেক" তথা প্রকাশ্যে মোসলমান ছিল। তাই হযরত (দঃ) তাহাকে মারিয়া ফেলার বিপক্ষে এই কথা বলিয়াছেন।)

**ব্যাখ্যা** :—উল্লেখিত হাদীছদ্বয়ে বর্ণিত ঘটনার বিবরণ দান ও মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণনায় ২৮ পারার ছুরা মোনাফেকুন নাযেল হইয়াছিল, যাহার তরজমা এই—

মোনাফেকরা আপনার সম্মুখে আসিলে বলে, আমরা শপথ করিয়া বলি এবং সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিশ্চয় আল্লার রসুল। আল্লাহ ত জানেনই, আপনি নিশ্চয় তাঁহার রসুল, কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য ও ঘোষণা দিতেছেন, মোনাফেকরা মিথ্যাবাদী, (তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বিশ্বাস ও স্বীকার করে না যে, আপনি রসুল।) তাহারা মিথ্যা কসমের আড়ালে থাকিয়া লোকদিগকে আল্লার পথ হইতে বিভ্রান্ত করে। তাহাদের এই কুকর্ম্ম বড়ই জঘন্য। এরূপ জঘন্য কাজে তাহারা লিপ্ত রহিয়াছে এই কারণে যে, তাহারা মুখে ঈমান প্রকাশ করিয়া (অন্তরে সর্ব্বদা কুফরী পোষণ করে এবং সুযোগ প্রাপ্তে) আবার মুখেও কুফরী প্রকাশ করে, ফলে তাহাদের দিলের উপর মোহর লাগিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর সুবুদ্ধির উদয় হইবে না।

আপনি তাহাদিগকে দেখিলে তাহাদের দৈহিক আকার-আকৃতি আপনার দৃষ্টিতেও ভাল লাগিবে, তাহারা কথা বলিলে আপনিও তাহাদের কথা শুনিবেন। (তাহাদের বাহ্যিক আকৃতি এবং মিঠা মিঠা কথা খুবই ভাল দেখায়, কিন্তু বস্তুতঃ ইসলামের ভিতর তাহারা মোটেই ঢুকে নাই—) তাহাদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেন কতগুলি থাম বা খুঁটি যাহার কোন অংশই মাটির ভিতরে ঢুকে নাই—কোন কিছুতে হেলান লাগান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। (এরূপ খুঁটিগুলি মোটা মোটা দেখাইলেও দাঁড়ানোর মধ্যে উহাদের কোনই শক্তি নাই, যে কোন মামুলী কারণে উহা পড়িয়া যায়। তদ্রূপ মোনাফেকদের বাহ্যিক অবস্থা ভাল দেখাইলে কি হইবে ঈমান ও ইসলামে স্থিতিশীলতার লেশ মাত্র তাহাদের নাই; যে কোন সুযোগে ইসলামদ্রোহী কথা ও ষড়যন্ত্রে তাহারা লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই দুর্ব্বলতার কারণে তাহারা সর্ব্বদা আতঙ্কিত ও ভীত থাকে;) কোন শব্দ শুনিলে মনে করে তাহাদের বুঝি বিপদ আসিল! (তাই তখন মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কসমের দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করে।)

তাহারা (আপনার মিশনের) চিরশত্রু, তাহাদের হইতে আপনি সতর্ক থাকিবেন। আল্লাহ তাহাদেরকে ধ্বংস করুন; তাহাদের বুঝ কতই না উল্টা! যখন তাহাদিগকে বলা হয় আস—দিলে-মুখে ইসলাম ও ঈমানকে গ্রহণ করিয়া আস! আল্লার রসুল তোমাদের পূর্ব্ব ত্রুটির জন্য আল্লার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন তখন তাহারা মাথা নাড়াইয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করে এবং দেখিবেন তাহারা আত্মম্ভরিতা পূর্ব্বক ঘাড় ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। এমতাবস্থায় তাহাদের জন্য আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা না করা সমান; আল্লাহ তায়ালা কস্মিনকালেও তাহাদেরে ক্ষমা করিবেন না। এরূপ নাফরমানদেরকে আল্লাহ হেদায়েতেরও তৌফিক দেন না!

ইহারাই বলিয়াছে, রসুলের দলে যাহারা আছে তাহাদের জন্য এক পয়সাও খরচ করিও না; তবেই তাহারা দল ছাড়িয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। স্মরণ রাখিও—আসমান জমিনের সমুদয় ভাণ্ডার আল্লার হাতে, কিন্তু মোনাফেকদের সেই বুঝ নাই।

ইহারাই বলিয়াছে, এইবারে মদীনায় পৌঁছিয়া শক্তিশালীগণ (তথা মদীনার অধিবাসী সংখ্যাগুরুগণ) দুর্ব্বলগণকে (তথা সংখ্যালঘু বিদেশী মোহাজেরদিগকে) মদীনা হইতে তাড়াইয়া দিবে। স্মরণ রাখিও—প্রকৃত প্রস্তাবে শক্তিশালী হইলেন আল্লাহ, আল্লার রসুল এবং মোমেন দল, কিন্তু মোনাফেকদের সেই জ্ঞান নাই।

হে মোমেনগণ! তোমাদের ধন-জন যেন তোমাদিগকে আল্লার ইয়াদ হইতে গাফেল—উদাসীন করিতে না পারে। যে ব্যক্তি ঐরূপ গাফেল হইবে তাহার জন্য ধ্বংস অনিবার্য্য। আর তোমরা আমার প্রদত্ত ধন-সম্পদ হইতে আমার পথে ব্যয় কর ইহার পূর্ব্বে যে, কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, আর তখন সে বলিতে থাকে, প্রভু হে!

আমাকে কিছু সময়ের সুযোগ দেন না কেন যেন আমি দান-খয়রাত করিতে পারি এবং নেককারদের দলভুক্ত হইতে পারি।

আল্লাহ কখনও অবকাশ দেন না কোন জীবকে তাহার আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পর। আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় কার্য্য-কলাপের খবর রাখেন।

**১৯৫৮। হাদীছ ঃ**—আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মুখে এই বিবরণ শুনিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগার "সাক" তথা তাঁহার এক বিশেষ ছিফত বিকশিত করিবেন। ইহার প্রভাবে সকল মোসলমান নারী-পুরুষ তাঁহার দরবারে সেজদাবনতঃ হইয়া পড়িবে। অবশ্য যাহারা দুনিয়াতে রিয়া তথা শুধু লোক-দেখান এবং শুধু প্রচার ও নাম-রটান উদ্দেশ্যে সেজদা করিয়া থাকিত (আর যাহারা কাফের ছিল—যাহারা খোদা ভিন্ন অন্যকে সেজদা করিয়াছে) তাহারা ঐ সময় সেজদা করার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। তাহারা সেজদার জন্য প্রস্তুত হইবে বটে, কিন্তু তখন তাহাদের পিঠ ও কোমর আস্ত কাঠের ন্যায় হইয়া যাইবে।

**ব্যাখ্যা ঃ**—ছুরা কলম ২৯ পারায় আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন ঃ—

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ - خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ - وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ -

"একটি স্মরণীয় দিন—যে দিন "সাক" বিকশিত হইবে। যাহার প্রভাবে সকল মানুষ সেজদার প্রতি ধাবমান হইবে। কিন্তু (আল্লাহ-ত্যাগী নাফরমান যাহারা) তাহারা সেজদা করিতে সক্ষম হইবে না। তাহাদের দৃষ্টি লজ্জাবনত থাকিবে, সব দিক দিয়াই অপমান ও লাঞ্ছনা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে। (দুনিয়ার জিন্দেগীতে) তাহাদিগকে (এক আল্লার জন্য) সেজদা করার প্রতি কত ভাবে ডাকা হইত এবং তখন তাহাদের অঙ্গ সমূহ সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। (ইচ্ছা করিলেই সেজদা করিতে সক্ষম হইত, কিন্তু তখন তাহারা সেজদা করে নাই। তাই আজ তাহাদের ইচ্ছা হইবে, কিন্তু সেজদা করার শক্তি পাইবে না, পিঠ ও কোমর কাষ্ঠের ন্যায় হইয়া থাকিবে।)

**১৯৫৯। হাদীছ ঃ**—(ছুরা কলম ২৯ পারায় হযরত নূহ আলাইহেচ্ছালামের জাতির কুফরীর বিবরণ দান উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের কতিপয় দেব-দেবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—) ওয়াদ্দ্, সুয়া', ইয়াগূছ্, ইয়াঊক্, নস্র্। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, প্রকৃত প্রস্তাবে এই সব নাম নূহ আলাইহেচ্ছালামের জাতির বিশিষ্ট নেককার লোকদের নাম ছিল। তাঁহাদের মৃত্যুর পর শয়তান তাঁহাদের সমাজের লোকগণকে এই উস্কানী দিল যে, তাঁহাদের

স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহাদের খানকায় তাঁহাদের নামে তাঁহাদের আকৃতির স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করা হউক। লোকগণ তাহাই করিল। তখন ঐ সব স্মৃতিফলকের কোন প্রকার পূজা-পাঠ করা হইত না, কিন্তু ঐ সব স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠাকারী—যাহারা উহার মূল তথ্য জ্ঞাত ছিল তাহাদের মৃত্যু হইলে পর পরবর্ত্তী অজ্ঞ লোকগণ ঐ সব স্মৃতিফলকের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল এবং উহা দেব-দেবীতে পরিণত হইয়া গেল। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) দেখাইয়া দেন যে, বর্ত্তমান যুগেও আরবের বিভিন্ন গোত্রে ঐ সব দেব-দেবীর প্রচলন রহিয়াছে যথা—দৌমাতুল্-জন্দল নামক স্থানে কাল্ব্ গোত্রে "ওয়াদ্দ্", হোজায়েল গোত্রে "সুয়া", জুরফ নামক স্থানে মোরাদ গোত্রে "ইয়াগুছ্" হাম্দান গোত্রে "ইয়াউক্", হিম্ইয়ার গোত্রে "নছ্র" নামীয় দেবতার প্রচলন এখনও রহিয়াছে।

● ৩০ পারা ছুরা "আবাছা" ১৩—১৬ আয়াত সমূহে আল্লাহ তায়ালা কোরআন শরীফের পবিত্রতা ও উচ্চ সম্মান সম্পর্কে বলিয়াছেন—"(এই কোরআন লৌহে মাহফুজের) অতি সম্মানিত, উচ্চ মর্য্যাদা সম্পন্ন পাক-পবিত্র পত্রসমূহে লিপিবদ্ধ; অতি মহৎ ও মহান ফেরেশ্তা লিখকগণের হস্তে সুরক্ষিত।"

**১৯৬০। হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন—যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং সে কোরআনের সুসংরক্ষক ও সুদক্ষ; কেয়ামতের দিন সে মহৎ ও মহান ফেরেশতা লিখকগণের তুল্য বিশেষ মর্য্যাদা লাভকারী হইবে।

আর যে ব্যক্তি কোরআন পাঠ করে এবং উহা তাহার পক্ষে কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সে বার বার উহাকে আওড়াইতে থাকে তাহার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

**১৯৬১। হাদীছ ঃ**—জুন্দুব ইবনে ছুফিয়ান বর্ণনা করিয়াছেন, এক সময় হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অসুস্থতা বোধ করিলেন। তাই তিনি দুই বা তিন রাত্র তাহাজ্জুদের জন্য উঠিলেন না। (তাহাজ্জুদের মধ্যে যে, তিনি সুদীর্ঘ কোরআন তেলাওয়াত করিয়া থাকিতেন এই দুই-তিন রাত্র তাহাও শ্রুত হইল না।) এতদ্ভিন্ন এই দুই তিন দিন ওহীবাহক জিব্রাইল ফেরেশতার আগমনও বন্ধ ছিল; (নূতন কোন ওহী-বাণী প্রচারিত হইয়া ছিল না।) এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া হযরতের প্রতিবেশিনী একটি নারী হযরতের সম্মুখে আসিয়া বলিল, হে মোহাম্মদ! আমার মনে হয়—তোমার নিকট যে ভূতটি আসিয়া থাকিত সে তোমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। দুই-তিন রাত্র যাবৎ তোমার নিকট তাহার আগমনের কোন খোঁজ পাই না।

(এইরূপ কটূক্তি ও কটাক্ষ হযরতের মনে যেন আঘাত হানিতে না পারে,) তাই আল্লাহ তায়ালা স্নেহপূর্ণ ভাষায় এই ছুরাটি নাযেল করিলেন—

وَالضُّحٰى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجٰى - مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ - وَمَا قَلٰى

"দিনের আলো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনীর শপথ—আপনার প্রভু আপনাকে ভুলেন নাই, ছাড়েন নাই এবং আপনার প্রতি বিরাগী হন নাই·····।"

**ব্যাখ্যা ঃ**—এই নাপাক কটূক্তিকারিণী নারীটি ছিল হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতি সর্ব্বাধিক বিদ্বেষ পোষণকারিণী হযরতের যাতায়াত পথে কাঁটা নিক্ষেপকারিণী সর্ব্ব পরিচিতা—আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে-জমীল। যাহার সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা রহিয়াছে যে, গলায় কাছি বাঁধিয়া তাহাকে ভয়ঙ্কর শিখাযুক্ত দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে। এহেন খবিস ঐরূপ বলিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।

কটাক্ষের উত্তরে আল্লাহ তায়ালা যে শপথ উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ। ওহী বাহক জিব্রাইলের আগমন দিবালোকের আগমন স্বরূপ এবং তাঁহার অনাগমন দিবালোকের অনাগমন তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী স্বরূপ। অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী দৃষ্টে কেহ বলিতে পারে না, বিশ্ববাসী বিরাগভাজন হইয়া গিয়াছে, বরং দিবালোক ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রজনী উভয়টিই মানুষের পক্ষে মঙ্গল জনক।

**১৯৬২। হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ আমাকে আদেশ করিয়াছেন, "লাম্‌ইয়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু" ছুরা তোমাকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য।

উবাই (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ তায়ালা কি আমার নাম উল্লেখ করিয়াছেন? নবী (দঃ) বলিলেন, হাঁ। উবাই (রাঃ) বলিলেন, আমি রব্বুল আলামীনের দরবারে আলোচিত হইয়াছি। এই বলিয়া তিনি (আনন্দে) কাঁদিয়া উঠিলেন।

**ব্যাখ্যা ঃ**— নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ) ছাহাবীগণের মধ্যে পবিত্র কোরআনের বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। সম্মুখেও নং হাদীছে উল্লেখ হইবে চারজন ছাহাবী হইতে কোরআন শিক্ষা করার পরামর্শ নবী (দঃ) দিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)।

**১৯৬৩। হাদীছ ঃ**—পবিত্র কোরআনের আয়াত—اِنَّا اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ আমি আপনাকে "কাওছার" দান করিয়াছি। এই "কাওছার" সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন, উহার উদ্দেশ্য হইল সমুদয় (মঙ্গল ও কল্যাণ ইত্যাদির) সুসম্পদ-ভাণ্ডার যাহা আল্লাহ তায়ালা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে দান করিয়াছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে এই বিবরণ বর্ণনাকারী সায়ীদ ইবনে জোবায়েরকে তাঁহার শাগের্দ বলিল, সর্ব্বসাধারণ তো বলিয়া থাকে কাওছার হইল একটি নহর বা হাওজের নাম যাহা বেহেশতের মধ্যে আছে। তিনি উত্তরে বলিলেন, ঐ হাওজটিও উক্ত সুসম্পদ-ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত যাহা আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে দান করিয়াছেন। (অর্থাৎ কাওছার বলিতে অনেক কিছু সম্পদই উদ্দেশ্যে ; সুপ্রসিদ্ধ হাওজে-কাওছার উহারই একটি।)

১২৬৩। **হাদীছ ঃ**—জিরর্ ইবনে আবী লুবাবাহ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি বিশিষ্ট ছাহাবী উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ)কে ছুরা কুল্ আউ'জু বে-রাব্বিন্নাছ ও ছুরা কুল্ আউ'জু বে-রাব্বিল্ ফালাক্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, এই প্রশ্ন আমিও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে করিয়া ছিলাম। হযরত (দঃ) বলিয়াছেন, এই দুইটি ছুরার মধ্যে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, আমি যেন এই ভাবে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় গ্রহণ করি—তাহা আমি করিয়াছি।

উবাই ইবনে কাআ'ব (রাঃ) বলেন, আমরাও হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) মারফৎ ঐ শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারই ন্যায় আশ্রয় প্রার্থনা করিব।

**ব্যাখ্যা ঃ**—এই হাদীছে একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। অনেকে মনে করিয়া থাকে এই ছুরা দুইটির বিষয়-বস্তুর আরম্ভেই বলা হইয়াছে, "হে মোহাম্মদ (দঃ)! আপনি বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি প্রভু পরওয়ারদেগারের.....", অতএব ইহা হযরতের ব্যক্তিগত সম্পর্কীয় বিষয়বস্তু, অন্যদের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক কেন হইবে? অথচ কোরআন পাক ত সারা বিশ্ব মানবের জন্য।

এই প্রশ্নের উত্তরই আলোচ্য হাদীছে দেওয়া হইয়াছে যে, এস্থলে আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে উপস্থিত লক্ষ্যস্থল স্বরূপ উল্লেখ করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দিয়াছেন এবং হযরত (দঃ) সে অনুযায়ী আশ্রায় গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার শিক্ষায় শিক্ষা গ্রহণ করিয়া ঐরূপ আমল করিব। যেমন উপরস্থ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোন আদেশ করা হয়, কিন্তু সেই আদেশ তাহার উপরই নিবদ্ধ থাকে না, তাহার নিম্নস্থগণও উহার আওতাভুক্ত হইয়া থাকে। এই ধরণের ভুরি ভুরি নজির কোরআন শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে।

## কোরআন শরীফের অবতরণ ও সংরক্ষণ বৃত্তান্ত

১২৬৫। **হাদীছ ঃ**—আবু ওসমান (রঃ) উছামা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একদা হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট উম্মুল-মোমেনীন উম্মে-ছালামাহ (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন এমতাবস্থায় জিব্রাইল (আঃ) ফেরেশতার আগমন